আমি দালাল বলছি

মিন্নাত আলী

আমি দালাল বলছি
মিন্নাত আলী

'আমি দালাল বলছি' বইটি শুধু গল্প বা প্রবন্ধ নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকলো। এ বই যে যুগের দলিল– সে যুগের মর্মান্তিক কাহিনী বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রায় এক। আপনার বইটি পড়ে এ সম্পর্কে আমার প্রতীতি আরো দৃঢ় হলো। আপনাদের অঞ্চলের দালালি চেহারা এ সর্বপ্রথম আপনার বইটিতেই দেখতে পেলাম। তথাকথিত 'দালাল'দের সম্বন্ধে গল্পাকারে যা লিখেছেন তার মানবিক দৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আর ঐ সব রচনার স্থায়ী মূল্যও ঐখানে। আপনার পর্যবেক্ষণ, তীক্ষ্ণ অনুভূতি আর প্রকাশের দুঃসাহস – সত্যই প্রশংসনীয়। কয়েকটি কাহিনী গল্প হিশেবেও অত্যন্ত সফল ও সার্থক হয়েছে। বিশেষ করে 'জতুগৃহে'র উল্লেখ করা যায়। দুঃখ বেদনা আর মানবিক বোধে ঐটি একটি চমৎকার গল্প হয়েছে।

স্থান-কাল-পাত্র— এ তিনের শিকলে মানুষ বাঁধা। এটা অনেক সময় বুঝতে না পেরে মানুষ ভুল করে। এ ভুল অনেক সময় ইচ্ছা করে করা হয়। তথাকথিত 'দালাল'দের সম্বন্ধে এ ভুল বারবার করা হয়েছে – এর পেছনে ব্যক্তিগত স্বার্থ আর রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিই বেশী কাজ করেছে। বহু গল্পে এ সবের নগ্নচিত্র আপনি এঁকেছেন। নির্ভয়ে অনেক সত্য উচ্চারণ করেছেন। লেখক হিসেবে এ সাফল্যের জন্য আপনি সানন্দবোধ করতে পারেন। এ গ্রন্থের অন্তর্গত অনেক গল্পই তীব্র, তীক্ষ্ণ এবং হৃদয়বেধ্য।

মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস আর তার পরবর্তী এ ক'বছর গোটা বাঙালী জাতিকে একটি দর্পণের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তাতে যে চেহারা প্রতিফলিত তা' একদিকে যেমন উজ্জ্বল তেমনি অন্যদিকে তা' অত্যন্ত কালো আর লজ্জাকর। আপনার বইটি সে বিরাট দর্পণেরই একটি অংশ।'

— আবুল ফজল

ISBN : 984-455-034-4
শিপ্র ঃ ১৮৫ ঃ ১৯৯৪

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

মিন্নাত আলীর অন্যান্য বই

মফস্বল সংবাদ

আমার প্রথম প্রেম

যাদুঘর

চোন ও জানা

না-বলা কথা

আমি দালাল বলছি

মিন্নাত আলী

শিল্পতরু প্রকাশনী

ISBN : 984-466-034-4
শিপ্র ঃ ১৮৫ ঃ ১৯৯৪

আমি দালাল বলছি

মিন্নাত আলী

প্রথম প্রকাশ ঃ
'বিজয় দিবস'
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৪

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
'স্বাধীনতা দিবস'
২৬ মার্চ ১৯৮০

প্রকাশক ঃ
শিল্পতরু প্রকাশনী
২৯১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৫০৮৩৫২ ৮৬৪২৬৪

প্রকাশকাল ঃ
ফাল্গুন ১৪০০
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

মুদ্রণে ঃ
শিল্পতরু প্রিন্টার্স এ্যান্ড এ্যাডভার্টাইজার্স
২৯১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ৫০৮৩৫২ ৮৬৪২৬৪

স্বত্ব ঃ
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কম্পোজ ঃ
শাহজাহান ও দেলোয়ারা

প্রচ্ছদ ঃ
মৃণাল নন্দী

মূল্য ঃ
৭৫.০০

AMI DALAL BALCHI
(HERE THE COLLABORATOR SPEAKS)
BY
MINNAT ALI

উৎসর্গ

উনিশ শ' একাত্তুর সালে
পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করেও
যারা বাংলাদেশের জন্য ভেবেছেন,
খেটেছেন; এমন কি আত্মদানও করেছেন,
সেই 'দালাল'দের উদ্দেশ্যে–

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পর 'আমি দালাল বলছি'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

'আমি দালাল বলছি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের 'বিজয় দিবসে'। তখন 'বঙ্গবন্ধু' বেঁচে আছেন। বাংলাদেশের কোন পত্র-পত্রিকাই তাঁর জীবদ্দশায় বইটির সমালোচনা করতে সাহস করেননি। 'বাংলার বিবেক' বলে কথিত প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় আবুল ফজল বইখানা পড়ে এর দোষ-গুণ উল্লেখ করে আমাকে যে পত্র লেখেন, তা-ই '৭৫ সালের ৮ই জুন 'ইত্তেফাকে' প্রকাশের ব্যবস্থা করি। সে সমালোচনা-পত্রটি পরে কুমিল্লার 'অলক্ত' নামক মাসিকীতেও পত্রস্থ করা হয়।

এ ছাড়া সাহিত্যিক বন্ধু সিরাজুল ইসলাম 'চিত্রালী'র 'প্রবেশ নিষেধ' কলামে 'আ-মি' নামের আড়ালে থেকে 'আমি দালাল বলছি'র কিছুটা মূল্যায়ন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৬-এর ১লা জুলাই চট্টগ্রামের 'জমানা'য় বইখানার বিস্তারিত, মূল্যবান আলোচনা করেন তিতাশ চৌধুরী। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

১৯৭৬ সালের ২রা জানুয়ারীর 'বিচিত্রা' 'গত বছরের বই' শীর্ষক আলোচনায় বলেন – ... যে ছোট গল্পের বইটি সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয়েছে গত বছর সেটির লেখক হলেন মিন্নাত আলী। গ্রন্থের নাম– আমি দালাল বলছি। ... একটি প্রকাশনা সংস্থা জানালো, বইটি প্রকাশের পাঁচ-ছ মাসের মধ্যে তারা বইটির প্রায় তিন হাজার কপি বিক্রি করেছেন।'

এমন যে বই তার 'দ্বিতীয় সংস্করণ' প্রকাশ করার কোন প্রকাশক পাওয়া গেলো না। উল্টো এ বইয়ের জন্যে আমার জীবনাকাশে দেখা দেয় দারুণ দুর্যোগ। এ অত্যাসন্ন দুর্ভোগ থেকে কিভাবে রেহাই পাই, সে কাহিনী 'আমি দালাল বলছি'র পরিপূরক আমার 'না-বলা কথা' বইতে বলা হয়েছে।

সহৃদয় কোন প্রকাশকই যখন পাওয়া গেলো না, তখন আমার মানুষ-সন্তানের জননী আমার মানস-সন্তানকে সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করার ভার নিলেন। তার আত্মিক ও আর্থিক সাহায্যেই 'আমি দালাল বলছি' পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হতে পারলো।

দ্বিতীয় সংস্করণে 'যে কথা হয়নি বলা' বিয়োজন করে নতুন ছ'টি গল্প সংযোজন করা হলো। এখানে বলাই বাহুল্য, গল্পগুলি বাংলাদেশ আমলে রচিত।

রাজধানীর বাইরে, মফস্বল থেকে বই ছাপা যে কী কষ্টকর অসাধ্য সাধন তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবেন না। এ ব্যাপারে 'ব্রাহ্মনবাড়িয়া ফাইন আর্ট প্রেসে'র লোকজন যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা' সত্যি প্রশংসার সাথে স্মরণীয়।

'শুভ বাড়ি', ব্রাহ্মনবাড়িয়া
'স্বাধীনতা দিবস', ২৬ শে মার্চ '৮০

মিন্নাত আলী

'Be hopeful then, gentlemen of the jury, as to death; and this one thing hold fast, that to a goodman, whether alive or death, no evil can happen nor are the gods indifferent to his well-being.

— Socrates

'যাঁরা যথার্থই ভালো মানুষ, তাঁদের মৃত্যুই হোক আর তাঁরা বেঁচেই থাকুন, বিধাতা সব সময় তাঁদের সহায় হন।'

— সক্রেটিস

আমি দালাল বলছি

মিন্নাত আলী

আমি দালাল বলছি

আমি একজন দালাল। হিন্দুর ঘরে জন্মালে হিন্দু, আর মুসলমানের ঘরে জন্মালেই যদি মুসলমান হওয়া যায়, আমি দালালের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও দালাল হবো না কেন? আমার মরহুম আব্বা আমাদের অঞ্চলে চেরাগ আলী দালাল নামেই মশহুর ছিলেন। নারায়ণগঞ্জ বন্দরে পাটের দালালীই তো আমাদের পৈতৃক ব্যবসায়।

ঃ কি বলছেন, এ দালাল সে দালাল নয়? ওহ্ বুঝেছি–আপনাকে যেমন 'হাজী' বল্লেও হজ্জ করা হাজী বোঝায় না এও তেমনি। তাই না?

ঃ না, আপনি দালালী করেছেন পাটের নয়–পাঞ্জাবীর।

ঃ না, আমরা বরাবর দালালী করে আসছি পাটেরই। অবশ্য উদ্দেশ্য পাঞ্জাবী-সার্ট প্যান্ট সবকিছু পাওয়া।

ঃ আরে না, আমি পিরহান পাঞ্জাবীর কথা বলছি না। আমি বলছি, আপনি এদেশে থেকে মিলিটারী পাঞ্জাবীদের সহযোগিতা করেছেন। অর্থাৎ দালালী করেছেন।

ঃ হ্যাঁ, এ কথা অবশ্য সত্য যে শত্রুর আগমনে কাপুরুষের মত আমি দেশ ছেড়ে পালাইনি।

ঃ কি, কি বল্লেন? আমরা যারা বর্বর নরাধম পাক বাহিনীর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য বন্ধুরাষ্ট্র ইণ্ডিয়াতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তারা কাপুরুষ?

ঃ ওমা, তওবা তওবা। কাপুরুষ? না–না, আপনারা হলেন খাঁটি দেশ প্রেমিক। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই তো আপনারা বিদেশে আশ্রয় নেন।

ঃ তাই তো। আমরা দলে দলে ভারতে চলে যাওয়াতেই তো ভারত সরকার সংখ্যাতীত শরণার্থী শিবির খুলে বিশ্বের দরবারে 'রিলিফ' চাওয়ার সুযোগ লাভ করে। এবং ফলে বাংলাদেশের উপরও বিশ্ববাসীর নজর পড়ে।

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। আপনারা সপ্রাণ দেশ থেকে কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে সত্যি প্রমাণ করলেন যে আপনারা একেবারে আগুনে পোড়া খাঁটি দেশ প্রেমিক।

ঃ কি, আমাদের ইয়ার্কি করছেন?

ঃ সর্বনাশ! কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে, হাজীদের নিয়ে ঠাট্টা করে। এমনিতেই দালাল আইনের খড়্গ সব সময় মাথার উপর ঝুলছে।

ঃ হ্যাঁ, সরকার ঠিকই করছেন। আপনাদের মত দালালদের জেলে পুরে রাখাই ঠিক।

ঃ আমাদের মত মানে?

ঃ মানে, আমাদের মত ওপাড়ে না গিয়ে এপাড়ে থেকে যারা চাকুরী করেছেন, মাসের পর মাস বেতন নিয়েছেন।

ঃ ও অতোক্ষণে সব বুঝলাম। আপনার রাগ ও অন্তর্জ্বালার আসল কারণ হলো, আমরা এপাড়ে থেকে চাকুরী করেছি, মাইনে নিয়েছি–এই তো?

ঃ নিশ্চয়ই। এটাই তো বড় রকম দালালী। আপনারা চাকুরীতে যোগদান করে এখানে

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনছিলেন।

ঃ নিজে আগে স্বাভাবিক অবস্থায় আসুন, তারপর বিবেচনা করে দেখুন আমরা এখানে কিরূপ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম। আপনারা ওপাড়ে শরণার্থী হয়ে জীবন সম্পর্কে একরূপ নিশ্চিত ও নিরুদ্বিগ্ন ছিলেন। আর আমরা এখানে মরণার্থীরা জীবন নিয়ে প্রতিটা মুহূর্ত কি ভয়াবহ অস্বস্তি ও উদ্বিগ্নের মাঝে কাটিয়েছি, তা আপনারা কোন হাজীই বুঝতে রাজী নন।

ঃ তা' অবশ্য ঠিকই বলেছেন। কিন্তু চাকুরী? চাকুরীতে জয়েন করলেন যে?

ঃ চাকুরীতে যোগদানের কথা বলছেন? শুনুন তবে। আপনারা ওপাড়ে গেছেন কি জন্য? না, বাঁচার জন্য। এক কোটি বাঙ্গালী নিছক বাঁচার তাগিদে হয়েছেন শরণার্থী। আর ছয় কোটি বাঙ্গালী যারা মরণার্থী হয়ে এপাড়ে রয়ে গেল, তাদের জন্য তো আর কোন রিলিফ বা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়নি। তাই এক মাস দু'মাস গ্রামের এবাড়ী ওবাড়ীতে যাযাবরের জীবন কাটিয়ে অবশেষে শুধুমাত্র বাঁচার জন্যই কাজে যোগদান করি–বেতন নিই আমরা।

ঃ শুধু চাকুরীই করেছেন? দালালী করেননি পাঞ্জাবীদের সাথে?

ঃ হুম, শুধু চাকুরীই করেছি। দালালীই যদি করতাম, তা'হলে এখানে মুক্তি ফৌজরা আসা-যাওয়া করতো কী ভাবে? এপাড়ের ছয়কোটি বাঙ্গালীর মাঝে থেকেই তো মুক্তি ফৌজ 'গেরিলা অপারেশন' চালিয়েছে শত্রুর বিরুদ্ধে!

ঃ তা না হয় মানলাম। কিন্তু তাই বলে আপনি কি বলতে চান, এখানে যে সব বাঙ্গালী ছিল, তাদের মাঝে কেউ দালালী করেনি?

ঃ না-না, তা' বলতে যাবো কেন? কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী, বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালী পাঞ্জাবীদের সমর্থন করেছে সত্যি। তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য–এই ছয় কোটির মাঝে তাদের আঙ্গুলেই গোনা যায়। যেমনি গোনা যায় শরণার্থীদের ক-জন খাঁটি দেশপ্রেমিক।

ঃ শরণার্থীদের দেশপ্রেমে আপনার সন্দেহ আছে নাকি?

ঃ কী যে বলেন! নিজের মাতৃভূমি-পিতৃভূমি বিশেষ করে নিজের স্বদেশের প্রতি প্রেম না থাকলে আপনারা কি আর কোন দিন ফিরে আসতেন? দেশের টানেই তো আপনারা আবার স্বদেশে এসেছেন।

ঃ নিশ্চয়ই। দেশপ্রেমেই আমরা বিদেশ ছেড়ে এসেছি। আর যাই হোক, আমাদের কেউ দালাল অপবাদ দিতে পারবেন না।

ঃ দালাল? আপনাদের? মানে হাজীদের? আপনারা হলেন গিয়ে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দেশপ্রেমিক। এ দেশে থেকে পাঞ্জাবীদের দালালী করতে হয়, এই ঘৃণ্য অপবাদ থেকে বাঁচবার জন্য আপনারা তো পাঞ্জাবীদের পা দেখার অনেক আগেই পগার পার হয়ে গেছেন।

ঃ ও পারে গিয়ে আমরা কতো খবর পাঠিয়েছি, চলে আসুন, ওই নরপশুদের বিশ্বাস নেই–দেশ গাঁয়ের মায়া ছেড়ে এখানে চলে আসুন–এখানে বিরাট বিরাট ক্যাম্প করা হয়েছে। আপনারা আমাদের কথায় কান দিলেন না।

ঃ না, আমরা আপনাদের আকুল আবেদনে সাড়া দিতে পারি নি। আমরা এখানে ঘরবাড়ী, আত্মীয় স্বজনদের মায়ায় দেশও ছাড়তে পারলাম না। রয়ে গেলাম দালালী করতে। কিন্তু

আমাদের বদনসীব, ঠিক মতো দালালী করতে পারলাম না বলে চোখের সামনে বাবাকে মারলো, বাবার সামনে ছেলেকে। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে বেইজ্জতি করলো, স্ত্রীর সামনে গুলি করলো স্বামীকে। আপনারা যারা খাঁটি দেশপ্রেমিক তারা তো রইলেন শরণার্থী শিবিরে, দেশপ্রেমের বর্ম ভেদ করে গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি কারো। আর আমরা দালালরা যারা ঘরবাড়ী, আত্মীয়-স্বজন ছাড়তে পারিনি– তাদের চোখের সামনেই ঘরবাড়ী পুড়লো, গ্রাম-গঞ্জ-বন্দর ভস্মীভূত হলো। আপনাদের ডাকে সাড়া দিইনি বলেই বিধাতার অভিশাপ নেমে আসে। অভিশপ্তনর-নারী গুলী খেয়ে মরলো এখানে, এক নয়, দু'নয়, তিরিশ লক্ষ দালাল।

ঃ নাহ, আপনার সাথে আর কথা বলা যাবে না। আপনি ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন দেখছি।

ঃ উত্তেজিত হয়ে থাকলে মাফ করবেন সাহেব। আসলে উত্তেজনা প্রকাশ করাই উচিত ছিল আমাদের। কিন্তু সময় বড় খারাপ। দালাল আইন দেশে এখনো বলবৎ।

ঃ দালাল আইনের ভয় করছেন কেন? আপনি যদি সত্য পথে চলে থাকেন, সত্য কথা বলতে অতো ডর কেন?

ঃ জ্ঞানী জনেরাই বলে গেছেন, স্থান কাল পাত্র বুঝে সত্য বলতে হয়। আর সত্য তো সব সময়েই অপ্রিয়। এই ধরুন না আমাদের শরণার্থী ব্যাপারটাই। ১৯৪৭ সালে দেশে যখন পাকিস্তান আসে, তখন দেখেছি, ভারত হতে আগত শরণার্থীদের জন্য সরকার কতো কি ই না করেছে। চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য সবখানেই শরণার্থীদের প্রাধান্য। এবার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও দেখছি, ভারত থেকে প্রত্যাগত শরণার্থীদেরই 'রাজত্ব' ঃ চাকুরীতে তাদেরই প্রমোশন, ব্যবসা–বাণিজ্যে তাদের 'পারমিট' আর জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাদের অগ্রাধিকার। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন কিছুই বলার উপায় নেই। সে সময়ে কিছু বললে সরকার পক্ষ থেকে বলা হতো–কম্যুনিষ্ট। আর এখন বলা হয়–দালাল।

ঃ আপনি যে অতো কথা বললেন, এতেই প্রমাণ পাচ্ছি যে আপনি সত্যি একজন দালাল।

ঃ না, আমার কথার জন্য নয়। আমার চাকুরীটা যদি যায়, আর সেখানে দেখেন একজন হাজী মানে শরণার্থী সমাসীন, তখন যথার্থই বুঝবেন আমি একজন খাঁটি দালাল।

আর বলাই বাহুল্য, সেদিনের সেই কথা মনে করেই আজ অতোকথা বললাম।

'অলক্ত' ঃ ডিসেম্বর ১৯৭২।

রক্ত ঝরার দিনে

পঁচিশে অক্টোবর–উনিশ শ' একাত্তুর।

রোজার চতুর্থ দিন। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেছি, আমাদের নাইট গার্ড এসে বললে, গতরাতে নন্দনপুর থেকে পাঁচজন মুক্তি ফৌজকে ধরে এনেছে। একজন হিন্দু–ওকে রাজাকার মঞ্জিলে রেখেছে,আর চারজন আছে জেল হাজতে।

খবরটায় বড় দমে গেলাম। গত ক'দিন ধরে শহরের আশপাশ গ্রাম থেকে মুক্তিদের তৎপরতার সুখবরই পাচ্ছি, এমন দুর্ঘটনার কথা তো কল্পনাও করিনি। এতদিন রোজই নতুন নতুন সাফল্যের খবর এসেছে, আর এসেছে মনের অগোচর থেকে সুরহীন গানঃ জয় হবে হবে জয়–বাঙ্গালীর তরে এই দেশ, দানবের তরে নয়।

কিন্তু আজ অমনটা হলো কেমন করে?

শুনলাম কোন রাজাকার নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দিয়েছে। প্রায় শ'আড়াইশ মুক্তিফৌজ ওপার থেকে ট্রেনিং শেষ করে মজলিশপুর নন্দনপুর দিয়ে পশ্চিমে ভৈরব অঞ্চলের দিকে যাচ্ছিলো। এ্যাদ্দিন যে রাজাকারটি এই পথ দিয়ে মুক্তি পারাপার করতো সে-ই গতরাতে মিলিটারীকে খবর দেয়। হিন্দু ছেলেটির পায়ে গুলি লেগেছে, মুসলমান ছেলে চারটি অক্ষত দেহে আত্মসমর্পণ করে। আর বাদবাকী সবাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

তক্ষুনি মনে মনে ঠিক করি এ মুক্তি ফৌজটির সাথে আলাপ করবো। ওর সাথে যে আমাদের অদৃশ্য সূত্রের আন্তরিক বন্ধন রয়েছে তা জানিয়ে ওকে উৎসাহ দেবো।

সকাল আটটায় কলেজে গেলাম। পাকিস্তান নামক ইসলামী রাষ্ট্রে এবার নতুন নতুন ক'টি অদ্ভুত ফরমান জারী করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীকে পুরোপুরি মুসলমান বানাবার মহৎ উদ্দেশ্যে স্কুল গুলোতে কোরআন শরীফ অবশ্য পাঠ্য করা হয়েছে; মুসলমান ছাত্র শিক্ষককে জোহরের নামাজ স্কুলে-কলেজে পড়া বাধ্যতামূলক করেছে। এ হেন ইসলামের জবরদস্ত সরকার আর আরবারের মতো 'রমজানের পবিত্রতা' রক্ষার জন্য শিক্ষায়তন বন্ধ না করে খোলা রাখার হুকুম দিলেন। আমরা অনিচ্ছা সত্বেও সে হুকুম তামিল করছি।

তিন চারজন অধ্যাপক উপস্থিত দেখলাম। ওঁদের বিষন্ন চোখ–মুখ দেখেই আমার সন্দেহ হলো, নিশ্চয়ই ওঁরা মুক্তির দুর্ঘটনার কথা শুনেছেন।

ঃ নন্দনপুরের ঘটনা শুনেছেন, স্যার? আমাকে বসবার সময়টুকুও দিলেন না ওঁরা।

কলেজে ছাত্রী নেই বললেই চলে।

আমরা অফিসে বসে নিচু গলায় মুক্তিবাহিনীর কথাই বলাবলি করছি, এমন সময় মোটর গাড়ীর হর্ণ শুনে চমকে উঠলাম। মিলিটারীর গাড়ী। মেজর খালেদ মাহমুদ আসেন মাঝে মাঝে। তিনিই এলেন নাকি?

আমাদের আতংকভাবের মধ্যেই মেজর খালেদ মাহমুদ মচ মচ করে আমার অফিস রুমে ঢুকলেন।

আমি দাঁড়িয়ে মেজরকে অভ্যর্থনা করলাম।

মেজর চেয়ারে বসতে বসতে জানতে চাইলেন, আজ ছাত্রী কত। শতকরা মাত্র চার-পাঁচজন ছাত্রী কলেজে এসেছে শুনে তিনি গর্জে উঠলেনঃ হাউ ফানী! আপনারা সব ছাত্রী আনছেন না কেন?

ঃ আমরা তো চেষ্টা করছি; ছাত্রীরা আসছে না যে।

ঃ চেষ্টা করছেন না কচু? মেজর সহসা মিলিটারী মূর্তি ধারণ করলেন। আমাদের আত্মা 'পানি-পানি' করতে লাগলো।

ঃ আমরা সব খবরই পাই। আসলে আপনারাই ছাত্রীদের 'ডিসকারেজ' করছেন। আমাকে ওদের 'এড্রেস' দিন। আমার সেপাই দিয়ে ওদের বাড়ী থেকে ধরে আনবো।

মিলিটারীর কাছে ছাত্রীদের বাড়ীর ঠিকানা দেওয়ার যে কি অর্থ তা বুঝি। তাই কাচুমাচু হয়ে বড় বিনীত ভাবে বললাম–

ঃ আর দু'দিন সময় দিন সাহেব, সব না পারি অর্ধেক ছাত্রীকে কলেজে হাজির করবোই, দেখবেন।

মেজর একটু দমলেন মনে হলো।

হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। বিজ্ঞের মতোন বলে চললেন, 'জানেন, দেশে এই যে বিশৃঙ্খলা দেখছেন, সব হিন্দুদের 'কলপাইরেসি'। এই ইষ্ট পাকিস্তানের হিন্দুরা ইণ্ডিয়ার সাথে মিলে-মিশে আমাদের পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চাইছে। এই তো আজ রাতেই একটা হিন্দু 'মিসক্রিয়েন্ট'কে ধরা হয়েছে। রাজাকার ক্যাম্পে দেখতে পাবেন। আমরা এ দেশে একটা হিন্দুও আস্ত রাখবো না। পাকিস্তান হবে কেবল মাত্র মুসলমানদের হোমল্যাণ্ড।'

আমরা চুপ করে মেজরের অমৃত বাণী নীরবে হজম করতে থাকি। মিলিটারীর কথা, মানতেই হবে। যুক্তি নয়, সত্য নয়, হয় তো অর্থহীনও বটে, তবু আমাদের মেজরের কথার প্রতিবাদ করার সুযোগ নেই। সাহস নেই।

আমি চুপ থেকে ভাবছিলাম পশ্চিমাদের মানসিকতার কথা। এ এক অদ্ভুত ও উদ্ভট মানসিকতা। আর এই অপূর্ব মনোভাবটি কাজ করছে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট থেকে তার সামান্য পশ্চিমা সৈনিকটি পর্যন্ত। তাই তো আমাদের শহরে দেখছি, হিন্দুর ঘরবাড়ী সব নিলামে বিক্রি করছে, হিন্দু পেলেই গুলী করে মারছে, আর হিন্দুর নাম শুনেই রক্ত গরম করে বড় বড় লাফ দিচ্ছে। আর এদিকে খোদ প্রেসিডেন্ট সাহেব বেতারে ওপারের উদ্দেশ্যে বলছেন– হিন্দু মুসলমান যারা ওপারে গেছো সবাই ফিরে আস–আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম।

হায়রে রাজনীতি!

চরম অপমান আর কঠোর শাসানী দিয়ে মেজর চলে গেলেন। সে-দিনের মতো বিদায় হলেন মেজর খালেদ মাহমুদ–ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরের স্কুল কলেজের ভারপ্রাপ্ত মিলিটারী অফিসার।

আমরা কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ মিলিটারী মেজরের সব গালি ও গ্লানি মাথা হেঁট করে গ্রহণ করলাম।

কলেজ শেষ করেই ছুটলাম কালীবাড়ীর দিকে।

অন্নদা স্কুলের সামনে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বিখ্যাত সেই কালীবাড়ীটাকে করা হয়েছে রাজাকার ক্যাম্প। কালীবাড়ীর সুদৃশ্য ফটকে আগে যেখানে পাথর খোদাই করা লেখা ছিল 'শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীবাড়ী' –সে লেখা ভেঙ্গে সমান করে ঝুলিয়েছে নতুন সাইনবোর্ড ঃ রাজাকার মনজিল–রহমান বাড়ী। বাংলা ও উরদূ হরফে।

কালীবাড়ী রোডে মুসলমানের ভিড়। শহরে তো গত সাত মাস ধরে একটি হিন্দুও নেই। মুসলমানরা এসেছে মুক্তি ফৌজটি দেখার জন্য। শহর ও আশপাশ গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই। দলে দলে যাচ্ছে–দল বেঁধে আবার ফিরে আসছে। সবার মুখই আবার মন্তব্যমুখর।

ঃ এটাই মুক্তি? এ তো ছেলেমানুষ!

ঃ কলেজের ছাত্র নাকি? কি সুন্দর চেহারা দেখেছো?

ঃ দেখেন গিয়ে স্যার, মাটিতে পড়ে রয়েছে! ডাক্তার একবারও আসে নি।

ভিড় ঠেলে এগুতে থাকি।

কিন্তু না, সামনে এগুনো আর সম্ভব নয়। ফটকের সামনেই বেশী ভিড়। ওখানে দাঁড়িয়েই সবাই ভিতরে উকি ঝুকি দিচ্ছে। ফটকে সশস্ত্র এক রাজাকার দাঁড়িয়ে। রাজাকারটি দর্শকের ঠেলা সামলাতে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছেঃ এই মিয়ারা, আর সামনে আগাইবেন না। এইবার যান। 'আউশ' মিটছে তো?

ফিরে এলাম।

ভিড় কমলে বিকালের দিকে আসবো খন।

ফেরার পথে নানা মুখ থেকে ছেলেটির কিছু পরিচয় পাই। নাম তার আশু রঞ্জন দে। ভৈরব কলেজের বি,এ, ক্লাসের ছাত্র। স্পোর্টসম্যান। সব খেলাতেই ওস্তাদ। ভৈরব বাজারে ওদের মিষ্টির দোকান আছে।

রাস্তায় এসে শুনলাম,থানাতে যে চারজন মুক্তিকে আটক করেছে, তাদের একজনের বাড়ী নাকি আমাদের ভৈরব অঞ্চলে। থানাতে গিয়ে কেউ কেউ ওদের দেখেও এসেছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কলেজের ছাত্রও আছে একজন।

থানায় যেতে আমার দস্তুর মতো লজ্জাবোধ হলো। ওরা যদি আমার চেনা লোক হয়ে থাকে আমিও তো ওদের পরিচিত হবো। আমি তো আমার বিচারে ওদের কাছে অপরাধী। ওরা, দেশের তরুণরা দেশের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করছে, আর আমি কিনা শহরে বসে বসে আরামসে চাকুরী করছি। এ পোড়া মুখ নিয়ে ওদের সামনে যাই কি করে?

লজ্জায় ওদের সামনে গেলাম না।

বিকালে এফতারের আগে আরেকবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু না–একই অবস্থা। কালীবাড়ীতে ভিড়ের কমতি নেই। সমানে দর্শনার্থী আসছে। একনজর, শুধু একনজর দেখতে চায়–মুক্তি কেমন। এ কেমন যোদ্ধা, যাদের পাকিস্তানী বীর সেনানীর মতো যোদ্ধারাও বলে–মুক্তি কোন চীজ? এ ইনসান, না জ্বীন?

পরের দিনও যখন আশু রঞ্জন দে কে দেখার কোন সুযোগ করতে পারলাম না, তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত করি— পর দিন খুব ভোরে ফজরের নামাজ পড়েই চলে যাবো কালীবাড়ী

'রাজাকার মজিলে'। তখন নিশ্চয় লোকের ভিড় থাকবে না।

তা-ই করলাম।

২৭শে অক্টোবর শেষ রাতে ছেহরী খেয়ে আর ঘুমালাম না। ফজরের নামাজ পড়ে নামাজী পোষাক নিয়েই বের হয়ে পড়ি। হ্যাঁ 'রাজাকার মজিলে' মুক্তি দর্শণার্থী নেই বললেই চলে। ফটকের সামনে যেতেই প্রহরী রাজাকারটি আমায় সালাম দিলে। বুঝলাম, আমার সাদা টুপী দাড়ি আর সাদা পাজামা পাঞ্জাবীই ওকে নরম করেছে। আমি ভিতরে যেতে চাইলে সে কোন বাধাই দিল না।

ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে এগুলাম।

দু'দিন অনাদৃত অবহেলায় মাটিতে রাখার পর রাত থেকে আশুকে মন্দিরের বারান্দায় রেখেছে।

কাছে, একেবারে বারান্দার উপর আশুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সুন্দর স্বাস্থ্যবান এক তরুণ। মাথায় রুক্ষ কোকড়ানো চুল, পরণে সার্ট, হাঁটুর নীচে দিয়ে তখনো লাল কালো রক্ত ঝরছে। একটা পুরানো চাদর দিয়ে পা দুখান ঢেকে আশু কোন রকমে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে। আমি হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেলাম। জানি, দুদিন ধরে কোন খাবার দেওয়া হয়নি। কোন রকম অষুধ দেয়নি। বীরের প্রতি এ চরম অবহেলা দেখে বলতে চাইলাম–আশু, তুমি তো জান, তুমি সত্যের জন্য লড়ছো। জেনো, সত্যের ক্ষয় নেই। তোমার রক্ত বৃথা যাবে না। তোমার জন্য আমরা গর্বিত, আমরা তোমার সাথেই আছি।

কিন্তু পাশেই দেখি, বারান্দার নীচে এক রাজাকার দাঁড়িয়ে। আমার মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করার সাহস পাই না। মুক্তির সমর্থক হিসেবে যদি পাকড়াও করে।

শুধু চোখ ভরে বাঙ্গালী বীর-যোদ্ধাকে দেখতে লাগলাম। দেখলাম বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মন্ত্রে দীক্ষিত এক তরুণ বাঙ্গালীর অপূর্ব আত্মাহুতির করুণ মধুর দৃশ্য।

এক সময় আশুর পাশে বসে পড়লাম।

আশু তো প্রথম কোন কথাই বলতে চায় না। আমাকে ওর বিশ্বাস নেই–আমি যদি দালাল বা গুপ্তচর হয়ে থাকি। কিন্তু আমার পরিচয় দিতেই সে বিহ্বলের মতো আমার দিকে তাকালো। তারপর সজল চোখে, ক্ষীণ কণ্ঠে বললো তার কথা। তাদের ধরা পড়ার কথা।

আগরতলায় ট্রেনিং শেষ করে ওরা প্রায় আড়াইশ মুক্তিযোদ্ধা–বি এল এফ–এর ৮৮ জন ও এফ এফ–এর ১৪২ জন ২১শে অক্টোবর সীমান্ত অতিক্রম করে। দিনের বেলায় লুকিয়ে থেকে রাতের অন্ধকারে রাজাকার ও দালালদের ফাঁকি দিয়ে নৌকায় করে ওরা বাসুটিয়া ইসলামপুর হয়ে মজলিশপুর পৌঁছে। এ লাইনে প্রত্যেক গ্রামেই মুক্তি ফৌজের ইনফরমার ও এসকোর্ট রয়েছে। ওদের সাহায্য ও নির্দেশেই ওরা ২৫শে'র রাতে মজলিশপুর আসে। এই দলের নেতৃত্ব করছিলো ভৈরবের শাহাদাত হুসেন বেণু। বেণু ছাড়া ভৈরবের আজাদ, আক্কাস, জাহের আরও ক'জন মুক্তি যোদ্ধাও ছিল আশুর সাথে।

২৫শে'র শেষ রাতের দিকে আশুরা অস্ত্রশস্ত্র সব বোঝা করে মাথায় নিয়ে মজলিশপুর থেকে নন্দনপুরের রাস্তায় ডবল মার্চ করে দৌড়াতে দৌড়াতে সি-এন্ড-বি রোড পার হতে চায়। এই বিরাট দলটি দৌড়তে দৌড়তে যখন নন্দনপুর পার হয়েছে, একদল সি-এন্ড-বি সড়কও অতিক্রম করে ফেলেছে এমন সময় 'এমবুস' করা রাজাকার ও পুলিশ বাহিনী হঠাৎ গুলাগুলী ছুঁড়তে থাকে। এই অতর্কিত আক্রমণে মুক্তি ফৌজ দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখন অস্ত্রশস্ত্রের-

বোঝা ফেলে দিয়ে মুক্তিরা আত্মরক্ষা করে পালায়। আশুর পায়ে গুলী লাগায় সে আর দৌড়াতে পারে নি–এক ধানক্ষেতের মধ্যে পড়ে যায়।

ঃ কি মৌলভী সাব–অত ফিসফাস কইরা কি কথা কইতেছেন অতক্ষণ? রাজাকারটি এগিয়ে এল সামনে। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

ঃ বলছিলাম, বাঙ্গালী হয়ে ওরা বাংলাদেশের অতো ক্ষতি করছে কেন? রাজাকারকে খুশী করার জন্য আমাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

রাজাকারটি এখানকার নয়–কিশোরগঞ্জ থেকে পাঠান হয়েছিলো কসবা যুদ্ধক্ষেত্রে। ও আমাকে চেনে না জানে না। ও আমার কথায় খুশী হয়ে বলে উঠলোঃ অতদিন পুল-রাস্তাঘাট ভাইঙ্গা দেশের ক্ষতি করছিলো এখন দেখেন নিজের ক্ষতি হওন শুরু হইছে। সব শালাদের এমন কইরা ধরবাম।

রাজাকারটি সরে গেলে আশু নীচু সুরে বললোঃ জানেন স্যার, গতকাল একটা রাজাকার বিশ্রী গাল দিয়ে আমার চুল ধরে টান দিয়ে ছিলো। আমি সহ্য করতে পারিনি। মাথা তুলে দেখলাম রাস্তায় বহু লোকের ভিড়। আমি স্থান কাল ভুলে চীৎকার করে উঠলামঃ দেখতে পাচ্ছ, আমাকে দেখার জন্য কতশত লোক আসছে? তুমি রাজাকার, বাংলাদেশের কলঙ্ক, মরলে শিয়াল কুকুরেও খাবে না–

ততক্ষণে ফটকে দর্শনার্থীর ভিড় শুরু হয়ে গেছে। লোকজনদের কেউ কেউ ফটক পেরিয়ে মন্দিরের কাছেও আসছে। আর থাকা যায় না, আমাকে সন্দেহ করতে পারে কেউ।

ঃ এবার আসি। ভৈরব গেলে তোমার কথা বলবো সবাইকে–

আশু রঞ্জন দে, পঙ্কু, মৃত প্রায় বীর মুক্তি ফৌজ আশু ধীরে ধীরে আমার চোখে চোখ রাখলো ঃ মরণে আমার কোন ভয় নেই স্যার। স্বাধীনতার মন্ত্রে আমরা দীক্ষিত। আমার রক্ত যেখানে পড়েছে সে স্থান পবিত্র– সে স্থান স্বাধীন হবেই দেখবেন।

২৯শে অক্টোবর শুক্রবার খুব সকালে উঠেই ছুটলাম রাজাকার মঞ্জিলে। কালীবাড়ি রোডে ভিড় নেই, সহজেই পৌঁছলাম ফটকের কাছে। সশস্ত্র পাহারাদার দাঁড়িয়ে। রাস্তার উপর দু-একজন পথচারী।

ভিতরে উঁকি দিলাম। না, কালী মন্দিরের বারান্দায় বা কালীবাড়ির মাঠে আহত আশু নেই।

রাজাকারটির কাছ থেকে আশুর খবর সংগ্রহ করলাম।

গেল রাতে পঙ্কু মৃত প্রায় আশুকে রাজাকার মঞ্জিল থেকে ট্রাকে করে নিয়ে গিয়ে নিয়াজ পার্কের পাশে কুড়ুলিয়া খালে গুলী করে মারা হয়েছে।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো আশুর রক্তাক্ত দেহটা। মুক্তিকামী বীর সন্তানের পূত রক্তে রঞ্জিত হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটি। মনে পড়লো কবি গুরুর বাণী–

বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রু ধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?

যখন বাড়িমুখো রওয়ানা হলাম, দেখি পূর্বাকাশে নতুন সূর্য উঠছে। লাল একসূর্য। আমার মনে হলো, আশুর বুকের লাল রক্তে যেন সূর্যটা বেশী লাল হয়ে উঠেছে।

লালে লাল এক নতুন দিনের সূর্য।

৩০ শে অক্টোবর, ১৯৭১

সব ছহী বাত্

লেখক জীবনের সব চাইতে বড়ো ট্রাজেডি হলো, আমার মতে, আমরা যখন সত্য কথা বলি, তখন পাঠক মনে করে সবই মিথ্যা। আর যখন সত্যি সত্যি মিথ্যা বলি, তখন দেখা যায় পাঠকবৃন্দ সমস্বরে বলে উঠেন, আরে এতো গল্প নয়। এর প্রতিটি কথা সত্য। এ নিয়ে মাঝে মাঝে বড়ই মুশকিলে পড়তে হয়।

কিছুদিন আগে 'সব ঝুটবাত' বলে আমার একটি গল্প বেরিয়েছিল। গল্পটি পাঠের পর আমাকে অনেকেই প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন ঃ আচ্ছা সাহেব, সত্যি করে বলুন তো আপনার 'ঝুটবাত' আসলে সত্যি কথা নয়? বিশ্বাস করুন, আমি ঝুটবাত্‌কে কোনমতেই মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করতে পারিনি। তাই ঠিক করেছি আর মিথ্যা নয়–এবার সত্যি সত্যি সত্য কথাই বলবো, একেবার খাস্ ছহী বাত্।

রক্ত ঝরার সেই লোমহর্ষক দিনগুলি। বাংলার কালো মাটিতে তখন বাঙ্গালীর লাল লহর দরিয়া। এখানে-ওখানে, এ গ্রামে-সে গ্রামে পাঞ্জাবীরা বাঙ্গালী ধরছে। ধরছে আর গুলী করে মারছে।

সেদিন উনিশ শ' একাত্তুরের সাতাশে অক্টোবর। দশটার দিকে 'কমিউনিটি হলে' লোকের ভিড়। সবার মুখে ওই এক কথা, না, ছেলের বুকের পাটা আছে বটে।

কে এ ছেলে? ব্যাপার কি?

এগিয়ে গেলাম সামনে।

সকালবেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহর থেকে মাইল দশেক দক্ষিণে 'তন্তর' নামক গ্রাম থেকে এক 'মুক্তি'কে ধরে এনেছে। ছেলেটি নাকি মুক্তি ফৌজের কমাণ্ডার। সাথে পিস্তল পাওয়া গেছে। এমনিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কমিউনিটি হলের দ্বিতল কক্ষে সাব-ডিপুটি মার্শাল ল' এডমিনিষ্ট্রেটর মেজর আব্দুল্লার অফিস। ছেলেটিকে মেজরের সামনে বন্দী অবস্থায় আনা হলো।

মেজরের সামনে, পাশে স্থানীয় শান্তি কমিটির সদস্য বৃন্দ।

মেজর বন্দীর দিকে চোখ তুলে বলেন– এখনো সময় আছে। সারেণ্ডার করো।

ঃ সারেণ্ডার ? মুক্তি নির্বিকারভাবে জবাব দেয়– সারেণ্ডার না করলে?

মেজর চেয়ারে সোজা হয়ে বসেন ঃ সারেণ্ডার না করলে তোমাকে গুলী করে মারা হবে।

হাসলো ছেলেটি। কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে আসামী যে ভাবে হাসে, সেই কাষ্ঠ হাসি ঃ মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছেন? আমরা তো মৃত্যুর পথই বেছে নিয়েছি।

চমকে উঠলো মেজর। হঠাৎ চোখের তারা দুটি জ্বলে উঠলো মেজর আবদুল্লার। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত জবাব।

ঃ আরে মিয়া অতো বড় কথা কইও না। পাশের চেয়ার থেকে শান্তি কমিটির জনৈক সদস্য বলে উঠেন, আপনি বাঁচলেই বাপের নাম। আত্মসমর্পণ কইরা ফেল।

ছেলেটি তার কথা কানেও তুললো না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মেজরের পেছনে, দেওয়ালে লটকানো ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার ম্যাপটির দিকে।

ঃ তা হলে তুমি মরবে বলেই ঠিক করেছো?– মেজরের তীক্ষ্ণ কর্কশ প্রশ্ন।

ঃ না, আমি মরতে চাইনা। তোমরা আমাকে মারবে বলেছো, তা'তেই আমি রাজী। – ছেলেটি এবার মরিয়া হয়েই বলতে থাকে– কিন্তু জেনে রাখ মেজর, আমার মতন নগণ্য একটি যুবককে মেরে তোমাদের কোন কাজই হাসিল হবে না। কেননা, আমার পেছনে যে লাখ লাখ মুক্তিকামী বাঙ্গালী রয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ এই তরুণ যুবকের সাহসদীপ্ত জবাব শুনে সবাই একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলো।

আমার মনে পড়ল, এমন সব তরুণদের অসামান্য তারুণ্যের ফলেই তো কালে কালে দেশের স্বাধীনতা এসেছে–এরাই তো স্বাধীনতা আনে।

ছেলেটির অসামান্য, তেজোদ্দীপ্ত জবাবের কথা ভাবতে ভাবতে সেদিন বাসায় ফিরি।

তারপর ছেলেটির কথা দিনে দিনে আমার মন থেকে কখন যে মুছে যায়, আমি টেরও পাইনা। চারিদিকে পাঞ্জাবী সৈন্যদের আনাগোনা আর বাঙ্গালী ধর পাকড়ের ত্রাসের মধ্যে কোন এক মুহূর্তে মুক্তিকামী সাহসী ছেলেটির কথা একদম ভুলেই যাই।

আরেক দিন। ১৯৭১ সালের ১৬ই নভেম্বর। কানে এলো স্থানীয় জেলখানায় কিছু মুক্তি ফৌজকে আনা হয়েছে। এ খবর শুনেই মনে মনে স্থির করে ফেলি, এবার 'মুক্তি'কে দেখবো–বাংলাদেশের মুক্তি পাগল দামাল ছেলেগুলিকে এক নজর দেখে নেবো। সম্ভব হলে আলাপও করবো।

১৬ই নভেম্বর, রোজার দিন, চললাম জেলে। (এখানে একান্তে বলে নিই, আমি আবার ক'বছর ধরে স্থানীয় জেলখানার সরকার মনোনীত বেসরকারী জেল পরিদর্শক) জেলার মোহাম্মদ ইসলাম ও কেরাণী আবদুল আলীম ভূইয়া যথাবিহিত সম্মানে আমাকে গ্রহণ করলেন। জেলার সাহেবকে চুপে চুপে বললাম, এখানে নাকি ক'জন 'মুক্তি' আছে–ওদের একটু দেখিয়ে দেবেন।

ঃ ঠিক আছে।– জেলার আশ্বাস দিলেন।

আমরা জেলখানার ভিতরে ঢুকেই সেই ওয়ার্ডে চলে গেলাম। আমরা ঘরে ঢুকতেই সব কয়েদী 'ফলিন' করে সারিবদ্ধভাবে উঁকি দিয়ে বসে পড়লো।

কেরাণী সাব আমাকে ঘরের এক কোণায় নিয়ে ক'টি যুবকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, এ ক'জনই মুক্তিফৌজ, স্যার।

আমি একজনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঃ তোমার নাম?

ঃ সামসুল হক। যুবকটি দাঁড়িয়ে বললো।

ঃ বাড়ি?

ঃ রায়পুরা থানায়, নীলক্ষ্যা।

দেখেই বোঝা যায়, কলেজের ছাত্র। কি সুন্দর স্বাস্থ্য, ফর্সা মুখ।

ঃ কোথায় পড়তে?

ঃ আমি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কলেজের ছাত্র, স্যার।

আমার সারা শরীর-মন অজানা উত্তেজনায় তখন কাঁপছে। নীরব থেকে এগুচ্ছি, আর কথা শুনছি।

ঃ আমার নাম সিদ্দিকুর রহমান।

ঃ আমার নাম আবু সাইদ।

ঃ আমার নাম হারিস মিয়া।

পেছনে থেকে কেরাণী সাব বললেন, এরা কেউ বাজিতপুর কলেজের ছাত্র। কেউ বা তোলারাম কলেজের। আর ওই–উনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রটির সামনে যাচ্ছি, টুপী মাথায় এক আধবুড়োর প্রতি আমার নজর পড়লো।

ঃ ইনি?

ঃ ইনি হলেন ঢাকা মোহাম্মদপুরের ও-সি সিরু মিয়া। মুক্তি বাহিনীতে ট্রেনিং শেষ করে ছাত্রদের সাথে ফিরছিলেন, রাস্তায় ধরা পড়ে। ওই দেখেন সাথে তার ছেলেও রয়েছে।

ছেলেটির সামনে দাঁড়ালাম।

ওয়েষ্ট এণ্ড হাই স্কুলের কিশোর আনোয়ার কামাল।

ফিরে আসি এ পাশে।

ঃ আমার নাম নজরুল ইসলাম। বাংলায় অনার্স পড়তাম, দ্বিতীয় বর্ষে।

বাংলাদেশের সবুজ, তাজা ক'টি তরুণ বীর।

অতোগুলো মুক্তি ফৌজের দুঃখ দুর্দশা আর শারীরিক নির্যাতনের চিহ্ন দেখে আমি সহসা স্থানকাল ভুলে গেলাম। আবেগে-উত্তেজনায় আমার চোখ মুখ গরম হয়ে উঠেছে বুঝতে পারি। হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলোঃ আপনারা যদি সত্যের জন্য লড়ে থাকেন, নিশ্চিন্ত থাকুন, সত্যের জয় হবেই। ভয় করবেন না, সমস্ত বাংলাদেশ আপনাদের পেছনে আছে।

জেল কেরাণী আমার হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করলেন। আমি তার দিকে তাকাতে চুপি চুপি বললেন, প্রকাশ্যে অমন কথা বলবেন না, স্যার। এদের মাঝে পাঞ্জাবীদের স্পাইও আছে।সাবধান।

আমি সাবধান হলাম।

অন্যান্য ওয়ার্ড পরিদর্শন শেষ করে আমি যখন বাইরে আসার জন্য প্রস্তুত, দেখি গেইটের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ছেলেটি দাঁড়িয়ে।

ঃ স্যার আপনার কথা সব শুনেছি।– ছেলেটি আমার দিকে চোখ তুলে হাসি মুখে বললো, আপনি মাঝে মাঝে আসবেন স্যার।

আমি এবার ভালো করে তার দিকে তাকাই। রোগা-পাতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, মুখে নাতিদীর্ঘ দাড়ি, পরনে লুঙ্গী শার্ট কিন্তু চোখে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি।

ঃ তোমার বাড়ী কোন খানে?

ঃ দাউদকান্দি।

ঃ ধরা পড়লে কোথায়?

ঃ কসবা থানার তন্তর গ্রামে।

'তন্তর' নাম শুনেই আমার মনের আকাশে স্মৃতির বিদ্যুৎ খেলে গেলো। এ-ই কি সেই বীর মুক্তি সৈনিক যে ২২শে অক্টোবর মেজর আবদুল্লার সামনে অসাধারণ জবাব রেখেছিল?

ঃ বল্লাম, তোমার সাথে রিভলবার ছিল?

ঃ জি, স্যার।

আর কোন সন্দেহ রইলো না।

বললাম, তবু ধরা পড়লে যে?

নজরুল সংক্ষেপে জানালো, দাউদকান্দির দিকে ক'টি অপারেশন শেষ করে আগরতলা ফিরে যাচ্ছিল। তন্তরের কাছে জনৈক কফিলউদ্দিন চৌধুরীর ছেলে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে ধরিয়েদেয়।

আমি সাথে সাথে বলি, তোমার সাথে পিস্তল ছিল, এর প্রতিশোধ নিলে না?

হাসি ফুটলো নজরুলের মুখে। স্মিতহাস্যে জবাব দিলো, মারবো কাকে স্যার? সেও তো একজন বাঙ্গালী!

আমি নির্বাক বিস্ময়ে বাংলাদেশের বাংলা বিভাগের এক বাঙ্গালী ছাত্রের অদ্ভুত বাঙ্গালী প্রীতির কথা ভাবছি আর নজরুল আপন মনে বলে যাচ্ছে তার কথা।

ঃ সেলিম কোথায়? ওই কলেজের প্রিন্সিপাল সাবের ছেলে, সেলিম আমার বন্ধু। আচ্ছা এক কাজ করতে পারেন স্যার? আমাদের মুনীর স্যারের ছেলে ভাষণ দাউদকান্দির অপারেশনে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ছিলো– তার কোন খবর পাইনি। তার খবরটা নিতে পারবেন, স্যার?

ইতিমধ্যে জেলের অন্যান্য লোকজন গেটের দিকে আসছে দেখে আমি সরে পড়ি। নজরুলকে আশ্বাস দিলামঃ তোমার কথা আমার সব মনে থাকবে।

জেলার সাবের রুমে বসে তাঁর সাথে আলাপ করছি, পাশের জানালায় দেখি, নজরুল ইসলাম। জানালাটি ভিতরের দিকে। এ পথে জেলার সাব কয়েদীর দেখা- শোনা করতে পারেন। নজরুলকে দেখে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠি।

ঃ কি ব্যাপার, এ দিকে আসলে যে?– জেলার সাব প্রশ্ন করতে করতে জানালার দিকে এগোন।

ঃ না, চাচা, তেমন কিছু নয়–প্রিন্সিপাল স্যারকে একটা কথা বলা হয়নি, তাই জানাতে এলাম।

আমি লক্ষ্য করলাম, নজরুল ইসলাম জেলার সাহেবকে 'চাচা' বলে ডাকতে শুরু করেছে, জেলার সাবও নজরুলকে সাধারণ কয়েদীর মতো না দেখে স্নেহ–দৃষ্টিতে আদর করছেন।

জানালার পাশে যেতেই ওপাশ থেকে নজরুল বললো–আচ্ছা স্যার, পলিটিক্যাল

সলিউশনের কী হলো?–জানেন স্যার, এ জেলের ক'টি মুক্তি ফৌজ স্বীকারোক্তি করে বহু মুক্তি সেনার নাম বলে দিয়েছে।

আমাকে নিরুত্তর দেখে নজরুল বলতে থাকে, আফসোস হয় স্যার। এই সব চরিত্রহীন লোকের জন্যেই আমাদের স্বাধীনতা অতো দেরীতে আসছে। একটু থেমে সে আবার বললো, জানেন স্যার আমাদের আরো রক্তপাতের প্রয়োজন। বিনা রক্তদানে তো একটা দেশের স্বাধীনতা আসতে পারে না, স্যার।

আমি নীরবে সব শুনে শেষে শুধু এটুকু বল্লাম ঃ নিরাশ হবার কারণ নেই–মুক্তি আমাদের আসন্ন।

২০ শে নভেম্বর ১৯৭১।

ঈদ-উল ফিত্‌র। ঈদগাহে মেলা লোক। আশাতীত। মেজর আবদুল্লাহ উরদুতে বক্তৃতা করলেন, মুনাজাত করলেন পাকিস্তানের জন্যে।

বারে বারে মনে পড়ে, জেলে বন্দী মুক্তিফৌজের ছাত্রদের কথা। বাসা থেকে পিঠা পায়েস দিলে কেমন হয়?

বাসায় ফিরে স্ত্রী-কন্যার সাথে পরামর্শ করলাম। ওরা দু'জনেই সোৎসাহে সায় দিলো এবং টিফিন কেরিয়ার তৈয়ার করতে গেলো। কিন্তু হঠাৎ একটা ভয় আমায় পেয়ে বসে। আমার এ টিফিন কেরিয়ারের ঘটনাটি যদি বাইরে জানাজানি হয়ে যায়, মিলিটারী টের পায় তাহলে তো সমূহ বিপদ।

তাহলে? হ্যাঁ ঠিক আছে, বিকালে জেলখানায় গিয়ে জেলর সাবের সাথে পরামর্শ করে নিই।

তখন দুপুর গড়িয়েছে। 'রেকটো' থেকে ঈদ সংখ্যা 'দৈনিক পাকিস্তান' একখান কিনলাম। কাগজখানা বগলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম জেলখানায়। জেলার সাবের রুমে বসে সব খবরাখবর নিই। ঈদ উপলক্ষে কয়েদীদের জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে– সেমাই, মাংস ইত্যাদি। কথায় কথায় নজরুলকে পিঠা পায়েস পাঠানোর কথাটা বললাম।

জেলার সাব একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, না-না সর্বনাশ, ও কাজটি করতে যাবেন না। এমনিতে পাঞ্জাবীরা আমাদের সন্দেহের চোখে দেখছে, তারপর যদি অমন ঘটনা ঘটে তা হলে আপনারও বিপদ, আমারও বিপদ, স্যার।

আমার উৎসাহ একেবারে চুপসে গেলো।

ঃ জেলের ভিতরে যাবেন? তালা খুলতে বলবো, স্যার?

ঃ না এখন আর ভিতরে যেতে চাই না। আপনি বরং নজরুল ইসলামকে ডাকান, একটু দেখেযাই।

সেপাই গিয়ে খবর দিতেই নজরুল ওপাশে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। বেশ হাসি খুশি মুখ।

ঃ কী, কেমন ঈদ করলে? তোমরা কি খেলে আজ?

নজরুল হাসতে হাসতেই জবাব দেয়, জেলের ভিতর থাকলেও আজ আমরা ঈদের খানা খেয়েছি। চাচা আমাদের আজ সেমাই, গোশ্‌ত সব দিয়েছেন।

নজরুল তেমনি হাসতে থাকে।

ঃ আপনার হাতে ওটা কি স্যার? দেখি?

আমি ঈদসংখ্যা দৈনিক পাকিস্তানখানা ওর হাতে তুলে দিলাম। নজরুল জানালা গলিয়ে দু'হাতে কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরলো।

আমার মনে পড়লো, কতোদিন ওরা কাগজ পড়ছে না–বাইরের জগতের কোন খবরই ওরা পাচ্ছে না, নিয়ে নিক কাগজখানা।

ঃ কাগজটা রেখে দেই, স্যার?

আমি কোন জবাব দেবার আগেই জেলার সাব হা-হা করে উঠলেন, না-না-না এ হয় না। বাইরের কোন কিছু দেওয়ার নিয়ম নেই।

ঃ না, চাচা, কেউ দেখবে না। কেউ জানবে না।– এই বলতে বলতে নজরুল কাগজটাকে ভাঁজ করে ওর গেঞ্জির ভিতরে লুকিয়ে ফেললো। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাতের বেলায় আমি একা একা পড়বো।

এ কথা বলেই সে হাসতে হাসতে জানালা থেকে মুখ সরিয়ে নিলো।

কিন্তু তখন কি আমি জানতাম, জানালা থেকে মুখ সরিয়ে নেওয়া মানেই দুনিয়া থেকে সরে পড়া?

ঈদের পরদিন ২১ শে নভেম্বর সকালে চলে গেলাম শহর থেকে দূরে। সরাইল কালিকচ্ছের এক গ্রামে। সেখান থেকে ফিরি ২২শে নভেম্বর সকাল ন'টা দশটার দিকে।

এসেই একজনের মুখে শুনলাম, গেলো রাতে জেলখানা থেকে গোটা পঞ্চাশেক বন্দীকে কুড়ুলিয়া খালের কাছে নিয়ে গুলী করে নৃশংসভাবে মেরে ফেলেছে। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলোঃ মুক্তিফৌজের ছেলেগুলিকে মেরে ফেলেনি তো।

ছুটলাম জেল খানায়।

জেলখানায় মিলিটারীদের আনাগোনা। সাহস হলো না কাছে যেতে। ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার গেলাম। মিলিটারী নেই বটে তবে জেলার সাবও অফিসে নেই। বাসায় চলে গেছেন।

ছুটলাম জেলার সাবের বাসায়।

হ্যাঁ, যা রটেছে তা' সত্যি বটে।

তবে ঠিক কতজনকে কাল মারা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা কিছুতেই প্রকাশ করলেন না– আইনের নিষেধ আছে বলে। শুধু বললেন, আপনার ছাত্ররা কেউ বেঁচে নেই।

আকাশটা সত্যি যেন মাথায় ভেঙ্গে পড়লো। আকাশের ভারে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো আর মনের আকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত ভাসতে লাগলো নানা ছবি, নানা মুখ। হাসি মুখের সেই তরুণ সাহসী বীর বাংলা অনার্সের ছাত্র নজরুল ইসলাম আর বেঁচে নেই? বেঁচে

নেই ওয়েষ্ট এণ্ড হাই স্কুলের কচি সবুজ ছেলেটিও? দেশের মুক্তির জন্যে অকাতরে প্রাণ দিলো তোলারাম কলেজের সেই নাম না জানা ছাত্রটি। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কলেজের সামসুল হক, বাজিতপুর কলেজের নিরীহ, খদ্দরের পাঞ্জাবী পরা ছাত্রটি–গুলী করে মারলো ঢাকা মোহাম্মদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ, টুপি-মাথায় মুন্সী কিসিমের মুক্তি পাগল মানুষটি কেও?

প্রথমে বিশ্বাসই হয় না, এ কেমন করে হয়? একদিন আগেও ওদের খোঁজ খবর নিয়েছি, কথা বলেছি একটা রাজনৈতিক মীমাংসা হবে বলে আশ্বাস দিয়ে এসেছি– সেই সংগ্রামী ছাত্রগুলি আর বেঁচে নেই? অসম্ভব।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো, জল্লাদ সরকার বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে, শহরে-বন্দরে যেভাবে বাঙ্গালী হত্যা করে চলেছে, তাদের পক্ষে এ হত্যা তো মোটেই অসম্ভব নয়।

আমি মাটির দিকে তাকিয়ে মাটির মতোই নীরব হয়ে রইলাম।

'গণবাংলা' ঃ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩

জতুগৃহ

মাঠের উপর দিয়ে শুধু বাক্স-পেটরা, গাটরী-বোঁচকা দৌড়ছে। ক্ষেতের আইলে-আইলে, ক্ষেত কোণাকুণী।

ঃ মিলিটারী আসছে।

ঃ পালাও, পালাও।

বাঁচার তাগিদে যে যেদিকে পারছে ছুটছে। গাঁটরী–বোঁচকা ছেলে মেয়ে বিচিত্র মানুষের বিষণ্ন মিছিল।

চারিদিকে থমথমে ত্রাস। জমাট ভয়।

রিক্সার উপর থেকে সব দেখা যায়।

ডানে-বাঁয়ে সবদিক থেকেই আতঙ্কগ্রস্থ নরনারীর সন্ত্রস্ত দৌড়াদৌড়ি।

হঠাৎ মুখ খুলে সাজেদা বেগম ঃ আরো আগেই আমাদের রওনা হওয়া উচিত ছিল। আমার বড় ভয় করছে।

ঃ ভয়? এখন আর কিসের ভয়?–ডক্টর হুদা অবাক না হয়ে পারে না।

ঃ যেভাবে লোক যাচ্ছে। নৌকা যদি না পাই।

ঃ ওহ্ তুমি ভাবছো নদী পার হওয়ার কথা? ডাক্তার হুদা সহজ সুরে বলার চেষ্টা পায়–বাসা থেকে যখন বেরিয়ে আসতে পেরেছি, আর কোন চিন্তা নেই। বাংলাদেশের মানুষ এখনো তার আতিথেয়তা ভুলেনি। তোমাদের বাড়ী পৌছুতে না পারলে কোন বাড়ীতে না হয় এক রাত মুসাফিরি করবো।

সাজেদা বেগমের মুখে কোন কথা নেই। জবাবটা তার মনঃপুত হয়নি বোঝা যায়।

নিঃশব্দ দু'টি ভীত প্যাসেঞ্জার নিয়ে রিক্সা চলতে থাকে। এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তা দিয়ে রিক্সা চলে পুরো প্যাডেলে। একটা দু'টা নয়–বহু রিক্সা। এবং রিক্সাওয়ালাদের মাঝে দারুণ প্রতিযোগিতা। কে কার আগে সোয়ারী নদীর ঘাটে পৌছে দিয়ে আবার ট্রিপ দিতে পারে। একেক ট্রিপে এখন অসম্ভব টাকা। তিন টাকার জায়গায় ক'দিন ধরে নিচ্ছে পনর বিশ টাকা। পঁচিশ ত্রিশ দিতেও অনেকে রাজী।

সাজেদা বেগমের আশঙ্কাই সত্য হলো।

শুধু নদী পার হতে কোন নৌকাই রাজী নয়। দূরের কেরায়া নিতে বসে আছে। এক কেরায়াতেই একশো দেড়শো টাকা পাওয়া যায়। নদী পার করে দিলে আর কতো পাওয়া যাবে? বড় জোর চল্লিশ পঞ্চাশ অবশ্য এও কম নয়। আগে তো উঠতো মাত্র সাত আট টাকা।

কি আর করা, অবশেষে নরসিংদীগামী এক নৌকাতেই উঠতে হলো। নৌকা নরনারী শিশুতে ঠাসাঠাসি। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই সাজেদা বেগমের–খেয়াল নেই ডাক্তার হুদার। গলুইয়ে পাটাতনের উপরই বসে পড়লো দু'জনে।

ঃ মেয়েলোককে ভিতরে বসতে দিন।

ঃ হাঁ, হাঁ। ভিতরে জায়গা আছে, ছইয়ের ভিতরে চলে আসুন। কোন কথা, কারো

আহবানে সাড়া দেওয়ার মন নেই তখন। পাল্টা জিজ্ঞেস করে সাজেদা বেগম ঃ নরসিংদী পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?

ঃ এই জোর তিন চার ঘন্টার ব্যাপার মেমসাব।–মাঝি অভয় দিতে চায়, বিকালের মধ্যেই পৌঁছে যাবো দেখবেন।

নৌকা ছাড়লো।

চৈত্রের খরা। তীক্ষ্ণ রোদের কণারা শরাঘাত করছে গুলুইয়ের যাত্রীদের উপর। সাজেদা বেগম, ডাক্তার হুদা হাঁস ফাঁস করছে আর নির্মমভাবে ঘামতে শুরু করেছে।

সাজেদা বেগমের অসহায় মুখখানার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার হুদার হঠাৎ মনে পড়লো তার গাড়িটার কথা। বিলাত থেকে ফেরার সময় সাথে করে নিয়ে এসেছে শেভ্রলেট কার–এক মাসও হয়নি। বাসায় গ্যারেজে রেখে চলে আসতে হয়েছে। গাড়িটা আনতে পারলে মানে গাড়ি চালাবার রাস্তা থাকলে, সাজেদা বেগমকে অমন করে রোদে পুড়ে ঘামতে হতো না।

ঃ তুমি ভিতরে গিয়ে বসো, সাজু।

ঃ রোদ শুধু আমার উপরই বর্ষণ করছে না। তুমিও চলো।

ডক্টর হুদার তখন বলতে ইচ্ছে করছিলো, আমি তো এই বাংলাদেশের, এই রোদে বিষ্টির মাঝেই মানুষ–ও রোদে আমার গা পুড়ে না, এ আমার গা-সওয়া।

কিন্তু বলার ইচ্ছাটা চেপে গেলো। ডক্টর হুদা বেশ ভাল করেই বোঝে, ও কথা এতোগুলো বাঙ্গালীর সামনে বলা মানে নিজেকে সবার কাছে হাস্যাস্পদ করে তোলা। তাই কোন ওজর আপত্তি না তুলে বললোঃ হ্যাঁ, তাই চলো ভিতরে গিয়েই বসি। রোদটা বড় কড়া।

নরসিংদী পৌঁছতেই বিকাল পেরিয়ে গেল।

সাজেদা বেগম একা নয়, ডক্টর হুদাও কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লো। যেটুকু বেলা রয়েছে, এতে দশ মাইল রাস্তা পার হওয়া সম্ভব হবে কি?

হাঁটা দিলো দুজনে। লাগেজ পত্র কিছুই নেই–দু'জনার হাতে দু'টি ব্যাগ। সাজেদা বেগমের কাঁধে ঝুলছে গর্ব থলিও। পথের সাথী রয়েছে অনেক। আদিয়াবাদ, রায়পুরার যাত্রীই বেশী। ওরা যাচ্ছে রায়পুরার উত্তরে, নয়াচর গ্রামে।

রাস্তায় সাজেদা বেগমরা দেখতে পেলো নরসিংদী কলেজে সাহায্য শিবির খুলেছে। দূরের যাত্রীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। বহু লোক ঢাকা থেকে এসে মুসাফিরখানায় উঠেছে। রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে রওনা দেবে সীমান্ত আগরতলার উদ্দেশ্যে।

খানাবাড়ি ছাড়াতেই সূর্য পশ্চিমের গাছে হেলে পড়ে। ডক্টর হুদা এবার রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। এ বিদেশ-বিভূঁয়ে অন্ধকার রাতে স্ত্রী নিয়ে যায় কোথা, নয়াচর তখনো সাত মাইল দূরে। তা'ছাড়া এদিককার পথঘাট ডক্টর হুদার মোটেই পরিচিত নয়। বিয়ের পর মাত্র একবার শ্বশুরবাড়ি এসেছিলো। তা-ও রেলপথে। শ্রীনিধি ষ্টেশনে নেমে নৌকায় করে গিয়েছিলো। আশ-পাশের গ্রামের নামও জানে না। শ্বশুর ঢাকাতে বাড়ি করেছেন। সেই ঢাকার বাড়ির সাথেই তার পরিচয়।

এ মুশকিলে আসান করলো সাজেদা বেগম।

ঃ আচ্ছা, এ দিকে নবীপুর নামে একটি গ্রাম আছে না? সহযাত্রীদের শ্রবণ আকর্ষণ করে সাজেদাবেগম।

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই সামনের গ্রামটাই তো নবীপুর।

ঃ নবীপুরের মৌলভী বাড়িটা কোন দিকে বলতে পারেন?

ঃ হ্যাঁ, মৌলভী বাড়ির সামনে দিয়েই তো আমরা যাবো।

ঃ কেন, মৌলভী বাড়ি দিয়ে তুমি কি করবে? ডক্টর হুদা অবাক হয়।

সাজেদা বেগম সাথে সাথে জবাব দেয় না। চুপ থেকে কি যেন মনে মনে ভাবে।

সবাই পা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঃ মৌলভী বাড়ির কথা বলছিলে কেন, বললে নাতো? ডক্টর হুদা চাপ দিতে থাকে। তোমার কোন পরিচিত বাড়ি নাকি?

ঃ মৌলভী বাড়িটা আমাদের একটু দেখিয়ে দেবেন? ডক্টর হুদার প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে সাজেদা বেগম যাত্রীদের সাথে আলাপ করে–ও বাড়িতেই আমরা রাত কাটাবো।

ঃ ওটা তোমাদের কোন আত্মীয় বাড়ি নাকি?

যুগপৎ বিস্ময় ও সংশয় ঝরে পড়ে ডক্টর হুদার প্রশ্নে।

নবীপুরের দিকে এগুতে এগুতে সাজেদা বেগম বলে–হুঁ!

মৌলভী বাড়িতে যখন তারা পৌঁছুলো তখন সবে মাগরেবের নামাজ শেষ হয়েছে। মুসল্লীরা তখনো জুম্মাঘর থেকে বেরুচ্ছে।

বাড়ির সামনে অচেনা দু'জন মেয়ে পুরুষকে দেখে হাফেজ সাব এগিয়ে আসেন।

ঃ আসসালামু আলায়কুম। আপনারা এখানে কা'কে চান?

ঃ আমরা আসছি ঢাকা থেকে। ডক্টর হুদা প্রতি সালাম দিয়ে আলাপ শুরু করে।

ঃ যাবো নয়াচর। –সাজেদা বেগম মাথা নীচু করে বলে।

ঃ নয়াচর?–চমকে উঠেন হাফেজ সাব। নয়াচর কার বাড়ি যাবেন আপনারা?

ঃ পেশকার বাড়ি। ডক্টর হুদা জবাব দেয়।

হাফেজ সাব পেশকার বাড়ির নাম শুনেই স্থান ও পাত্র ভুলে সরাসরি চোখ তুলে সাজেদা বেগমের উপর। কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন সাজেদা বেগমের মাঝে। ক'টি অর্থময় নীরব মুহূর্ত মাত্র। তারপরই সহসা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি– সে কি, দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আসুন। ঘরে এসে আগে বসুন। তারপর কথা হবে খন।

বার বাড়ির ঘরে হাফেজ সাব দু'জনকে নিয়ে ওঠেন।

ঃ নিন, এই চেয়ার দু'টায় বসেন আপনারা। দু'খানা পুরান কাঠের চেয়ার সামনে এনে দিলেন। ওরে, এই ঘরে একটা হারিকেন দিয়ে যা রে।

হাফেজ সাব বরাবর ঢাকাতেই থাকেন। তিনি কয়েকদিন আগে বাড়ি এসেছিলেন, গোলমাল শুরু হয়ে যাওয়ায় আর যাননি। ঢাকায় এক মাদ্রাসায় তালেবুল এলেমদের শিক্ষা দেন। 'হাফেজিয়া' পড়াও পড়ান তিনি।

একটি ছেলে এসে ঘরে হারিকেন বাতি দিয়ে গেল। ইতিমধ্যে ঢাকার লোক এসেছে শুনতে পেয়ে গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই ঘরে এসে ভিড় করেছে। সবার মুখেই ওই এক কথা– ঢাকার খবর কি সাহেব? আমাদের বাঙ্গালীদের নাকি মেরে খতম করে দিচ্ছে?

ডক্টর হুদা যথাসম্ভব তাদের কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছে। বাঙ্গালীদের প্রতি ইয়াহিয়া সরকারের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী তারা শুনতে পেয়েছে–শুনে শুনে জল্লাদ বাহিনীর উপর গ্রামবাসীদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ জমে উঠেছে বুঝতে পেরে ডক্টর হুদা ভিতরে যেন খুশী হয়–খুশী হয়েই বাঙ্গালীদের উপর নির্মম অত্যাচারের ঘটনা একেক করে বলতে থাকে।

গলা খাঁকারী দিয়ে ঘরে ঢুকেন হাফেজ সাব। পাশের লোকজন সরে গিয়ে তার জায়গা করে দিলো।

ঃ আপনাদের এই রাতের বেলা নয়াচর পাঠাবো না। হাফেজ সাব পাশের একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলেন। আজ আমাদের বাড়িতেই বেড়াবেন আপনারা।

সাজেদা বেগম চুপ করে রইলো। ডক্টর হুদা এ কথা শুনে অবাক হয়ে যায়। হাফেজ সাব অমন বেড়ানোর প্রস্তাব করছেন কেন? তারা তো এসেছে এখানে থাকার জন্যেই! সাজেদা বেগমের আত্মীয় বাড়ি জেনেই তো এখানে উঠেছে! আত্মীয় হয়ে অমন প্রস্তাব করে নাকি কেউ?

সাজেদা বেগমকে চুপ করে মাথা হেঁট করে বসে থাকতে দেখে ডক্টর হুদাই জবাব দেয় ঃ হ্যাঁ , আপনাদের বাড়িতে মুসাফিরির নিয়তেই তো এসেছি। এ কথা বলে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

ঃ আপনার স্ত্রীকে বাড়ির ভিতর পাঠিয়ে দিন।–হাফেজ সাব সাজেদা বেগমের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে বলেন, তিনি ভিতর বাড়িতে মেয়ে ছেলেদের সাথে থাকুক।

ঃ হ্যাঁ তাইতো–তুমি বরং ভিতরেই চলে যাও।

ঃ না-না। সাজেদা বেগমের দৃঢ় কণ্ঠ–আমি এখানে বসে আগে রেষ্ট নিই। দরকার মতো আমিই যাবো।

এমন কথার পর আর কারো আপত্তি থাকতে পারে না। হাফেজ সাব এবার ডক্টর হুদাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসেন–

ঃ আচ্ছা , ঢাকায় তো বেশ ক'দিন থেকে এলেন, আপনার কি মনে হয়? পাকিস্তান টিকবে তো?

ডক্টর হুদা এমন ধারা প্রশ্ন শুনে হঠাৎ ভ্যাবাচেকা খেলো। সাজেদা বেগম স্থান-কাল-পাত্র ভুলে হাফেজ সাহেবের মুখের দিকে চোখ তুলে। বলছে কি লোকটা? ঘরভরা কৌতূহলী বাঙ্গালীরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছে বোঝা গেল। তারাও ডক্টর হুদার মুখ থেকে জবাব শোনার জন্য অধীর হয়ে উঠলো।

ডক্টর হুদা ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে ধীরে ধীরে বলে, আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। পাকিস্তান টিকবে মানে কি? পাকিস্তান তো টিকে আছেই।

ঃ না, আমি বলছিলাম, শুনছি একদল লোক নাকি ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীকে

একসাথে করে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার সংগ্রাম করছে।

ঃ হ্যাঁ, এটাতো সত্য কথাই। ডক্টর হুদা কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়ে, বাঙ্গালী সৈনিক ও পুলিশরা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করতে। ২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তানী জল্লাদরা পিলখানা আর রাজারবাগ পুলিশ লাইনে কিভাবে বাঙ্গালী বধ করেছে সে অমানুষিক বর্বরতার কাহিনী শুনেছেন?

কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে হাফেজ সাব মৃদু আপত্তি করেনঃ জানেন তো, শোনা কথার দোনা দোষ। লোকে কত কথাই ছড়ায়–এসব বাজে কথায় আমাদের কান দেওয়া উচিত হবে না।

সাজেদা বেগম নড়েচড়ে বসে আবার হাফেজ সাবের দিকে তাকায়ঃ বাংলাদেশে এখনো এমন লোক আছে?

হাফেজ সাব কিন্তু তখনো বলে যাচ্ছে তার কথাঃ আচ্ছা আপনিই বলুন, পাকিস্তানে বাস করে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার অবমাননা, জাতির পিতা কায়েদে আজমের ছবি পুড়ানো এসব কি কোন যুক্তিযুক্ত কাজ হয়েছে? আর এইটারই বা কি যুক্তি দেবেন–২৩শে মার্চ তারিখে শেখ সাব নিজে হাতে তাঁর বাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করলেন কিভাবে? এসব কি রাজদ্রোহী কাজ নয়?

সাজেদা বেগম অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো। ঘরভরা বাঙ্গালীদের মাঝেও চাপা একটা গুঞ্জন শোনা যেতে লাগলো। সাজেদা বেগমের সমস্ত শরীরটা হঠাৎ রাগে রি রি করতে লাগলো। বাংলাদেশের কুলাঙ্গার এই লোকটার সামনে থেকে চলে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। বলা যায় না তারপরে আরও কি সব অশ্রাব্য মন্তব্য তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

সাজেদা বেগম হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো।

ঃ আমি বাড়ির ভিতরে যাবো।

ডক্টর হুদা একটু অবাক হলো। খানিক আগেই ভিতর বাড়ির যাওয়ার প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। এখন নিজের থেকেই চলে যাচ্ছে যে বড়।

হাফেজ সাব একজনকে আদেশ করলেন, এই, তুই হারিকেনটা নিয়ে উনাকে বাড়ির ভিতর দিয়ে আয়। আর মিয়ারা, তোমরা একটু সরো। সরো। মেয়ে মানুষ দেখছো না?

হারিকেনের সাথে সাজেদা বেগমও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খেতে বসে ডক্টর হুদা অবাক না হয়ে পারে না। অতো অল্প সময়ে অতো রান্নাবান্না করলো কেমন করে? আলু ভাজি, বয়দা বিরান, মুরগীর গোসত, মশুরীর ডাল, দুধ, কলা মেহমানদারীর কোন ত্রুটি নেই। ডক্টর হুদার মনে হলো, গ্রামীন বাংলার মেহমানদারীর আন্তরিকতা বহুদিন বহু কালের একটা চিরন্তন ট্যাডিশন। সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান পতনও গ্রাম বাংলার এই ট্র্যাডিশনের কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি।

খাওয়ার পর পরই সাজেদা বেগম চলে আসে বার বাড়ির ঘরে।

ঃ আমি কিন্তু ভিতর বাড়িতে থাকতে পারবো না–তোমার সাথে এখানেই থাকবো আমি।

ডক্টর হুদা আশ্চর্য হয়ে বলেঃ এ কেমন করে হয় সাজু? লোকে বলবে কি?

ঃ না, ভিতর বাড়িতে থাকলে আমি মরে যাবো–

ঃ এ্যাঁ! বলো কি? ভিতর বাড়িতে কি হয়েছে?

ঃ সে তুমি বুঝবে না। স্মৃতির জ্বালায় অতোক্ষণ আমি যে কী এক অশান্তির মাঝে কাটিয়েছি। না, না, আমি আর ভিতর বাড়িতে যেতে পারবো না।

ডক্টর হুদা কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। নির্বাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর মুখে।

গলা খাঁকারী দিয়ে ঘরে ঢুকলেন হাফেজ সাব।

ঃ আপনার শোবার ব্যবস্থা এখানেই করছি। আপনার 'ওয়াইফ' ভিতর বাড়িতে মেয়ে ছেলের সাথে শোবেন।

সাজেদা বেগম জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায় স্বামীর দিকেঃ বলো, তুমি বলে দাও, ও আমার সাথে এখানেই থাকবে।

ডক্টর হুদা স্ত্রীর চোখের ভাষা বুঝতে পারে। কিন্তু ও কথাটা অতো খোলাখুলি বলতে পারছে না। কেমন জানি বাঁধ-বাঁধ ঠেকে। লজ্জায় সঙ্কোচে।

সাজেদা বেগম তেমনি তাকিয়ে আছে ডক্টর হুদার চোখে। কৈ, বলছো না যে!

ঃ আপনি বিশ্রাম করুন। আমি ভিতর বাড়িতে দেখি, উনার শোবার ব্যবস্থা হলো কিনা।– এই বলে হাফেজ সাব ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছেন, পেছন থেকে কথা বলে উঠে সাজেদা বেগম।

ঃ উনাকে বলে দাও, আমি ভিতর বাড়িতে আর যাবো না। এখানেই শুবো।

ঘুরে দাঁড়ালেন হাফেজ সাব। একটুখানি নীচের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর ডক্টর হুদার দিকে চোখ তুলে বল্লেন ঃ মেয়েছেলে বাড়ির বাইরের ঘরে রাত কাটাবে, এটা কি খুব শোভনীয় হবে?

ডক্টর হুদাকে মুখ খোলার সময় দিলো না। দপ করে জ্বলে উঠলো সাজেদা বেগমঃ নয়াচরের পেশকার বাড়ির সাজেদা বেগম আজ ভিতর বাড়িতে রাত কাটিয়ে গেলে বুঝি খুব সুনাম হবে, না?

ডক্টর হুদা, হাফেজ সাব দুজনেই একেবারে থ হয়ে গেলো। ডক্টর হুদা স্ত্রীর এ কথার কোন অর্থ বুঝতে না পেরে অবাক হলো। আর হাফেজ সাব সাজেদা বেগমের কথার গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করে একেবারে নিশ্চল মূর্তি হয়ে গেলেন।

সমস্ত ঘরটাতেই হঠাৎ করে কঠোর স্তব্ধতা নেমে আসে। কারো চোখে বা মুখে কোন কথা নয়। সাজেদা বেগম নিজেও কথাটা বলে কেমন যেন শরমিন্দা হয়ে পড়েছে, মাথা নীচু করে রইলো। নৈশ রাত্রির নীরবতা ঘরটাতে খাঁ খাঁ করতে লাগলো।

এই শ্বাসরুদ্ধকর অস্বস্তি থেকে বাঁচালেন হাফেজ সাবই।

প্রবল একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি ঃ ঠিক আছে, আপনারা ঘুমান আমি বিছানাপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। আস্‌সালামু আলায়কুম।

বার ঘরে শুয়েও সাজেদা বেগম ঘুমাতে পারলো না।

এশার নামাজের পর থেকে গ্রাম একবারে নীরব। লোক চলাচল থেমে গেছে অনেকক্ষণ। চালের উপর ঝুঁকে পড়া গাছের ডালে যে পাখীর বাসা সেখানেও পাখা ঝাপটা-ঝাপটি থেমে গেছে। দূরে-অদূরে মাঝে মধ্যে কুকুরের ঘেউ ঘেউ রাত্রির নীরবতাকে একটু সচেতন করে আবার থেমে যাচ্ছে। সাজেদা বেগম দু'চোখের পাতা খুলে সব শুনছে।

ঘুম আসে না।

পাশে স্বামী ডক্টর হুদা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। বড় ঘুম কাতুরে। লণ্ডনে প্রথম প্রথম দিনের বেলায় ঘুমিয়ে পড়তো। এ নিয়ে সাজেদা বেগমকে কম ধকল সইতে হয়নি।

ঘাড় কাত করে তাকালো ডক্টর হুদার দিকে। ঘরের ভিতর হারিকেন টীম করে রাখা হয়েছে। এই স্বল্প আলোতে দেখলো তার ঘুমন্ত স্বামীকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি অধ্যাপক ডঃ নাজমুল হুদা পি, এইচ-ডি। সদ্য বিলাত ফেরত।

পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করে নিদ্রাদেবীকে স্মরণ করে সাজেদা বেগম।

সময় গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

হঠাৎ সাজেদা বেগমের মনে হলো তার পাশে শুয়ে আছেন, কাঁচা দাড়িঅলা হাফেজ সাব! তার স্বামী।

চমকে উঠে সাজেদা বেগম চোখ মেলে।

না, পাশে ডক্টর হুদাই ঘুমাচ্ছে। তার প্রাণ প্রিয়স্বামী।

নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে সাজেদা বেগম।

কিন্তু না, চোখ মুদলেই পষ্ট চোখে ভাসে, তার পাশে হাফেজ সাব শুয়ে আছেন।

আবার চোখ মেলে। পাশে ডক্টর হুদা।

চোখ বন্ধ করে। পাশে হাফেজ সাব।

বিরক্ত হয়ে উঠে সাজেদা বেগম। যে ছবির ভয়ে ভিতর বাড়িতে গেলো না, সে ভয়ই পেয়ে বসলো তাকে। যে কথা সে সযতনে ভুলে ছিল, তা-ই-দীর্ঘ দিন পর অমন করে আষ্টেপৃষ্ঠে ওকে জড়িয়ে ধরছে কেন? না, এই মৌলভী বাড়িতে আসাটাই সাজেদা বেগমের ভুল হয়েছে।

চোখ মেলে সে দেখতে লাগলো তার একুশ বছর আগের দিনগুলিকে। আব্বা তখন ঢাকার এস, ডি, ও অফিসের পেশকার। সাজেদা বেগম মুসলিম গার্লস স্কুলের ক্লাশ এইটের ছাত্রী। আব্বার কেমন করে জানি মাদ্রাসার ছাত্র কলিমউদ্দীনকে জামাই করার সখ হলো। বাড়ির সবার অমতে তিনি সাজেদা বেগমের বিয়ে দিলেন। সাজেদা বেগম অশ্রু সায়রে ভাসতে ভাসতে এলো নবীপুর মৌলভী বাড়ি!

কিন্তু মন মানে না। গ্রামের পরিবেশ, মৌলভী স্বামী কিছুই তার পছন্দ হয় না। আব্বা-আম্মা জানলেন সব। আত্মীয় স্বজনরাও প্রমাদ গণলো।

ঢাকা গেলে সাজেদা বেগম আর নবীপুর আসতে চায় না! জোর জবরদস্তি করে আব্বা আম্মা নবীপুর পাঠায়। এভাবেই এক বছর কেটে যায়।

সাজেদা বেগম সেবার আম্মার সাথে বলে, নবীপুরের নাম বললে আমি বিষ খাবো।

ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় অবশেষে। সাজেদা বেগম আবার পড়াশুনায় মন দেয়। প্রাইভেট ম্যাট্রিক পাস করে ইডেনে ভর্তি হয়। তারপর বাংলায় অনার্স। শেষে এম, এ, এবং সরকারী কলেজের অধ্যাপিকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি অধ্যাপক নাজমুল হুদার সাথে বিয়ে হলো। মন বিনিময়ের পরই। সবই জানালো নাজমুল হুদাকে। নাজমুল হুদা সব জেনে শুনেই সাজেদা বেগমকে বিয়ে করে। সাজেদা বেগমকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে–'আমি সাহিত্যের ছাত্র, মানুষের মনকে বুঝি, শ্রদ্ধা করি। জগতের আর সব কিছুর সাথে মানুষের মনের পরিবর্তনেও আমি বিশ্বাসী। তুমি আমার একান্ত, একান্তই আমার হয়ে থাকবে, আমার ভালবাসা পাবে।

আট-ন' বছর অধ্যাপনার পর নাজমুল হুদা সরকারী বৃত্তি পেলো। চলে গেলো লণ্ডনে। কিছুদিন পর নিয়ে গেলো সাজেদা বেগমকে। নাজমুল হুদা ফিরলো ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে, সাজেদা বেগম আনলো এম, এস।

ফিরেছে মাত্র তিন মাস হলো–উনিশ শ' একাত্তুরের জানুয়ারীতে। পোষ্টিং নিয়ে কিছু গোলমাল গেলো কিছুদিন। সাজেদা বেগমের চাকুরী হয়ে গেলো সরকারী কলেজে। ডক্টর হুদা আপাততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেও এখানে থাকবার বিশেষ ইচ্ছা নেই তার।

শুরু হয়ে গেলো অসহযোগ আন্দোলন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারা বাংলা উর্মি মুখর সাগরের মতো জেগে উঠলো।

ঃ জয় বাংলা।

ঃ আমাদের সংগ্রাম–

ঃ মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ঃ সংগ্রাম–

ঃ চলবে চলবে

ঃ জাগো জাগো–

ঃ বাঙ্গালী জাগো

এমন সময় সাজেদা বেগমের কানে এলো আজানের সুর লহরী– আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান্নউম–

চমকে উঠে সাজেদা বেগম। সর্বনাশ! সকাল হয়ে গেছে–সে তো একটুও ঘুমায়নি।

পাশে ডক্টর হুদা তেমনি ঘুমাচ্ছে।

বাইরে পাখপাখালীর কিচির-মিচির। বাড়ির ভিতরে মানুষ উঠার মৃদু কলরব। জুম্মাঘরে মুসল্লীদের গলা খাঁকারী।

সাজেদা বেগম বিছানায় উঠে বসে।

ঠেলা দেয় স্বামীর পিঠেঃ এই, ওঠো। সকাল হয়ে গেছে।

স্বামীকে জাগিয়ে সাজেদা বেগম ভিতর বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। উঠানে যেতেই ঘর থেকে ছুটে আসে হাফেজ সাবের স্ত্রী ঃ কি, পায়খানায় যাবেন?

ঃ হ্যাঁ, চলুন আপনাদের কুয়ার পাড়ে যাই।

উত্তর ঘরটার পাশ দিয়ে পশ্চিম ভিটের কোণায় বাড়ির পাতকুয়া। সাজেদা বেগম কুয়ার দিকে যেতে যেতে উত্তর ঘরটার দিকে তাকিয়ে থাকে–এই ঘর, হ্যাঁ এই ঘরটাতেই সাজেদা বেগম প্রথম উঠেছিলো। এ ঘরটাতেই সে থাকতো। তার স্বামীর ঘর।

অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে সাজেদা বেগমের বুকে।

কুয়ো থেকে পানি তুলে বদনা ভরে হাফেজ সাবের স্ত্রী বলেন ঃ এই নিন পানি–ওই দেখেন পায়খানা।

সাজেদা বেগম বদনা নিয়ে উত্তর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

ঃ আচ্ছা ওই যে পাকা জায়গাটা, বাথরুম বুঝি, ওটাতে যাওয়া যায় না?

হাফেজ সাবের স্ত্রী অবাক হয়ে যান ঃ তিনি এ খবর জানেন কি করে? এ বাড়িতে কি আগেও তিনি এসেছেন?

প্রকাশ্যে বললে– ওই বাথরুম কেউ ব্যবহার করে না।

ঃ কেন? ব্যবহার করে না কেন?

হাফেজ সাবের স্ত্রী আমতা আমতা করে বলেনঃ শুনেছি, এই বাথরুম যার জন্য তৈয়ার করা হয়েছিল, সে এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়াতে ওটাতে তালা দেওয়া হয়েছে। কাউকে ব্যবহার করতে দেন না।

সমস্ত শরীরটা সহসা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে সাজেদা বেগমের। মাথাটা ঝিমঝিম করতে শুরু করে। মনের আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠে। কিশোরী বধু সাজেদা বেগমের অনুরোধেই এই বাথরুমটা তৈরি হয়েছিল। শহরের মেয়ে পাত–কুয়ার খোলা মেলা জায়গায় গোসল করতে অসুবিধা হয়, এ কথা বলার সাথে সাথেই সে দিনের তরুণ হাফেজ সাব ওস্তাগার ডেকে বাথরুম তৈয়ার করান। উত্তর ঘরের ভিতর থেকে দরজা কেটে বাথরুমের সাথে সংলগ্ন করা হয়।

মনে পড়লো, হাত-মুখ ধোয়ার জন্য বা গোসলের জন্য সাজেদা বেগমকে আর ঘরের বাইরে আসতে হতো না। ওই দরজা খুললেই বাথরুমে যাওয়া যেতো।

ঃ কি, পায়খানায় যাবেন না?

চমকে উঠে সাজেদা বেগম ঃ ও, হ্যাঁ, এই তো যাচ্ছি।

নাস্তা পর্ব শেষ হলো। এখন বিদায়ের পালা। সাজেদা বেগম সবই করেছে। যান্ত্রিক নিয়মে। মনের ভিতর একটি কথার উথালি পাথালিঃ হাফেজ সাব কি এখনো মনে রেখেছে তাকে? সেই সকাল থেকে বারে বারে মনে পড়ছে বিভূতি বাবুর একটি কথা। পথের পাঁচালীর বিভূতি বাবু তাঁর 'দেবযান' বইতে বলেছিলেন। অনেকদিন আগের পড়া। তবু কথাগুলো মনে আছে সাজেদা বেগমের ঃ চাপা পড়া আর ভুলে যাওয়া এক জিনিষ নয়। মানুষের মনের মন্দিরে অনেক কক্ষ, এক এক কক্ষে এক এক প্রিয় অতিথির বাস। সে কক্ষ সেই অতিথির হাসি-কান্নার সৌরভে ভরা, আর কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। প্রেমের এ অতিথিশালা বড় অদ্ভুত, অতিথি যখন দূরে থাকে তখনও যে কক্ষ সে একবার অধিকার করেছে সে তারই এবং তারই

চিরকাল। আর কেউ সে কক্ষে কোনোদিন কোন কালে ঢুকতে পারে না।

বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে সাজেদা বেগম ও ডক্টর হুদা যখন রাস্তায় নেমে পড়েছে, তখনো সাথে সাথে হাফেজ সাব চলেছেন।

ঃ আমরা গরীব মানুষ। আপনাদের উপযুক্ত সমাদর করতে পারলাম না ডাক্তার সাব, আমাদের গোস্তাকী মাফ করবেন–

ঃ কি যে বলেন? হাসতে হাসতে বলে ডক্টর হুদা, আপনাদেরই তো কষ্ট দিয়ে গেলাম। আমরা তো রইলাম আরামেই।

সাজেদা বেগম যে কথাটা বলার জন্য সকাল থেকে আঁকপাকু করছিলো অতোক্ষণে যেন সে সুযোগ মিললো। রাস্তার মাঝে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো সাজেদা বেগম।

ঃ হ্যাঁ, তুমি একটু হাঁটো। আর এই যে, আপনি একটু শুনুন–

হাফেজ সাব মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

ডক্টর হুদা সামনে এগুতে লাগলো।

সাজেদা বেগম একটু ইতস্তত ঃ করে শেষে বলেই ফেলে ঃ একটা সত্য কথা বলবেন?

ঃ কি?

ঃ আপনি এখনো আমার কথা মনে রেখেছেন?

হাফেজ সাব সাথে সাথে মাথা হেঁট করলেন।

মাটির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন–

ঃ আপনি একজন পরস্ত্রী। ও সব কথা শুনতে চাওয়া বড় গোনাহর কাম।

ঃ এ্যাঁ! পরস্ত্রী!

চলার কথা, পথের কথা, সব কিছু ভুলে সাজেদা বেগম নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইলো হাফেজ সাব, তার প্রথম স্বামীর মুখের দিকে।

'পূর্বদেশ' ঃ নভেম্বর ১৯৭২

বারাঙ্গনা স্ত্রী

ওকে নিয়ে সত্যি মুস্কিলে পড়েছি। কিছুতেই ও বুঝতে রাজী নয় যে ওটা ছাপার ভুল। আমরা যতই ওকে বোঝাতে চাই, আরে ছাপাখানার ভূত আছে না, ওই ভূতের কাণ্ডই এটা।

রোকশানা তখন বেশ বিজ্ঞের মতই বলে, অতশত শব্দ থাকতে তোমার ভূত পছন্দ করলো ওই বারাঙ্গনাকে?

ঃ আবার বলছো বারাঙ্গনা? বল্লাম না, ওটা বারাঙ্গনা নয়–বীরাঙ্গনা। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং তোমাদের এই খেতাব দিয়েছেন।

রোকশানা খানিক চুপ থেকে আবার মুখ খুলে, 'বঙ্গবন্ধু' যথার্থই বাংলাদেশের বন্ধু। এককালে বাঙ্গালীর জন্য ছিলেন 'দেশবন্ধু'–আর কয়েক যুগ পরে আমাদের ত্রাণের জন্য এলেন 'বঙ্গবন্ধু'। না, তাঁর আন্তরিকতার উপর আমার কোন সন্দেহ নেই। আসলে আমি যা, অদৃশ্য হস্তের কারসাজিতে তাই ছাপা হয়েছে।

এবার আমাকে কঠোর না হলে আর চলে না।

ঃ দেখ রাকা, যা ঘটে গেলো তার জন্য তো তুমি একটুও দায়ী নও– তোমার তো কোন হাত ছিল না এতে। তবু কেন বার বার নিজেকে অমন হীন অপরাধী মনে করছো?

রোকশানা চুপ করে থাকে।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আমার পাশে। বুকের উঠানামা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, জোরে জোরে শ্বাস টানছে রোকশানা। পাশ ফিরে আমার একখানা হাত রাখলাম বুকে। রোকশানার সান্নিধ্যে গেলাম আরো। দু'হাত দিয়ে আমার হাতখানা বুকের উপর থেকে সরাতে সরাতে প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে উঠে ঃ না, আমায় ছুঁয়ো না। আমার এ গা তুমি স্পর্শ করো না।

আমি জোর করে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরলাম।

ঃ তুমি আমার স্ত্রী। আমার যেমনি খুশী তেমনি ধরবো, স্পর্শ করবো। তুমি না করবার কে?

আগের মত হাসলো না। বরং অধিকতর বেজার হয়ে আমার সকল বেষ্টনী থেকে নিজকে সরাতে সরাতে রোকশানা বলে, তোমার রসিকতা রাখ। সত্যি বলছি আমাকে আর কষ্ট দিও না।

ঃ কষ্ট?– আমার হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে এলো।

ঃ হাঁ কষ্টই তো। রোকশানা ধীরস্থির ভাবে বলে, তোমার আদর সোহাগ সবকিছুই আমাকে পীড়া দেয়, কষ্ট দেয়।

ঃ আমার আদর-সোহাগে তুমি কষ্ট পাও? আশ্চর্য!

ঃ তোমার কাছে আশ্চর্য ঠেকতে পারে, কামাল। কিন্তু এ কথা তুমি কোনোদিনও বুঝতে পারবেনা তোমার আদর ভালবাসা গ্রহণ করতে আমি কতখানি অক্ষম, কতখানি অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছি।

ঃ তোমার কেবল ঐ একই কথা। আমি বাধা দিতে চেষ্টা করি। তোমাকে অক্ষম

অনুপযুক্ত বলছে কে, শুনি? আমার কোন কথায় বা ব্যবহারে তার আভাস পেয়েছ কি?

ঃ না-না, তোমার দিক থেকে কোন ত্রুটিই দেখছি না। রোকশানা আমার কথার প্রতিবাদ করে বলে, তুমি তো ঠিক আগের মতই আমায় ভালবাসছো। সেই সাত বছর আগে বিয়ের পর যেমন ব্যবহার করতে এখনও ঠিক তেমনি। কোন কোন সময় মনে হয় তার চেয়েও বেশি আদর করছো।

ঃ তা হলে?

ঃ কিন্তু আমার মন যে কোন মতেই একে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। আমি তো কোন মতেই ভুলতে পারছি না যে, আমি পাপী, আমি ধর্ষিতা।

রোকশানার দু'চোখের কোণায় পানি চিকচিক করতে লাগলো।

ঃ তুমি ধর্ষিতা সত্যি, কিন্তু পাপী নও। আমি সান্ত্বনা দিতে চাই, আর তোমার এই ঘটনা তো তোমার আমার সম্পর্কে কোন ফাটলই ধরাতে পারেনি। তবু কেন অত ভাবছো, রাকা?

ঃ ভাবি তোমার কথা নয় কামাল। রোকশানা কিছুটা স্বাভাবিক করে বলতে চায়, তোমার ওই শিশুটির দিকে যখন তাকাই তখন যে চোখ ফেটে কান্না আসে আমার। আমি যে কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারছিনা কামাল। ও এখন ছোট, কিছুই বোঝে না–শুধু জানে, মিলিটারী ওর আম্মাকে ধরে নিয়ে গেছিল। কিন্তু বড় হয়ে ও যখন সব বুঝতে শিখবে, ওর সাথীরা যখন বলবে, তোর আম্মা–না, না, আমি আর ভাবতে পারি না কামাল।

আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে রোকশানা। উপুড় হয়ে উদগত অশ্রুকে লুকোতে চায়।

সারা শরীর বিছানার উপর ঢেউ খাচ্ছে। কান্নার আবেগে পিঠ, কোমর, বারে বারে উঠছে নামছে।

হাত দিয়ে ঠেলে রোকশানাকে চিৎ করতে চেষ্টা করি। একটু নড়ে চড়ে সে হঠাৎ কাত হয়ে আমার বুকে অশ্রুসিক্ত মুখ লুকালো।

ঃ মিছেই ভাবছো তুমি, রাকা। আমি ওর অবিন্যস্ত চুলের ভিতর আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলি, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ তোমাদের কি দৃষ্টিতে বিচার করছে জানো না! বাঙ্গালীর কাছে আজ তোমরা সত্যি বীরাঙ্গনা–তোমরা স্বাধীনতার জন্য যে মূল্য দিয়েছো ত্রিশলক্ষ মানুষের রক্তের দামেও তার মূল্যায়ন সম্ভব নয় রাকা।

রোকশানা কোন কথা বলে না। আমাকে দু'হাত দিয়ে আরো নিবিড় করে ধরে আমার বুকে সান্ত্বনার শান্তি খুঁজে।

আমিও এবার চুপ করি।

দু'জনেই চুপ চাপ। ঘরের ভিতর নীলাভ আলো। পাশের টেবিলে টাইম পীচের টিক টিক একটানা ডাক। আমার বুকে কান্নাক্লান্ত রোকশানা।

চোখের তারায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠে সে দিনের ছবি।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে শহর ছেড়ে পালাই। ছোট কন্যাটি, রোকশানা আর কিছু জিনিষ পত্তর। দশ মাইল দূরে এক গ্রামে। শহরের খবর রীতিমত পাই। পাক বাহিনী শহর দখল

করেছে–সবাইকে যার যার কাজে যোগদান করার জন্য আহবান জানিয়েছে।

আমি অফিসে যোগদান করতে চাইলাম। রোকশানা কিছুতেই রাজী হয় না। শহরে গেলে আর ফেরা যাবে না। মিরিটারী গুলী করে মেরে ফেলবে।

এমন হয়েছে অনেক ঘটনা।

দু'মাসে পকেটের টাকা সব শেষ হয়ে গেছে। গ্রামে পালিয়ে থাকলে উপোষে মরতে হবে। নিজের গ্রামের বাড়িতে যাওয়া কোন মতে সম্ভব নয়। এখন উপায়?

ইতিমধ্যে গ্রামে ডাকাতি শুরু হয়ে গেছে। প্রায় রাতেই ডাকাতি হয়। কেউ বলে রাজাকার। কেউ বলে মুক্তিফৌজ। ভয়ে ভয়ে আর ঘুম হয় না।

অথচ শহর স্বাভাবিক হয়ে গেছে। লোকজন পরিবার পরিজন নিয়ে শহরে গিয়ে বসবাস করছে। স্কুল কলেজ খুলেছে। শহরে কোন ভয় নেই। ভয় শুধু গ্রামে। গ্রামেও মিলিটারী আসতে শুরু করেছে।

অনেক ভেবেচিন্তে শহরেই চলে এলাম। মহকুমা শহর। আমার বাসাটা আগুনে পুড়েনি, তবে সব মাল লুট-পাট হয়ে গেছে।

রোকশানাকে নিয়ে নতুন করে ভাঙা বাসা জোড়া দিতে বসি। দিনের বেলায় অফিস। নামকা ওয়াস্তে অফিস। কোন কাজ নেই। বিকাল ছ'টা থেকে কারফিউ। বাসার দরজা বন্ধ করে বসে থাকি। পাশের বাসায়ও তিন চারজন আছেন। সবাই ভয়ে তটস্থ। কোন সময় মিলিটারী এসে কাকে ধরে নিয়ে যায়।

কারফিউর ভিতরই সন্ধ্যার পর মিলিটারীর গাড়ি এলো। আমার বাসার সামনে। কড়া নাড়া শুনে দরজা খুলে দিলাম।

মেজর মাসুদ। আমাদের অফিসে রোজই দেখি।

আমাকে সালাম দিয়ে জানালে, ব্রিগেডিয়ার রব তাকে পাঠিয়েছে। ক্যাম্পে একটা গানের জলসা হবে। রোকশানাকে যেন দিই। জলসার পর মেজর নিজে গাড়িতে করে দিয়ে যাবে। ভয়ের কোন কারণ নেই।

রোকশানা ভাল গাইতে পারে, শহরের সবাই তা জানে। সব ফাংশনেই ও গেয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে মিলিটারী ক্যাম্পে? এই রাতে?

ঃ তুমি বিশ্বাস করো কামাল আমি মারা যাবো– মরে যাবো শীগগীরই। আমার বুক থেকে মুখ তুলে সহসা বলতে থাকে, তোমাকে বোঝাতে পারবো না আমার বুকের ভিতরটা কি করছে? তিল তিল করে কুরে খাচ্ছে আমার হৃদপিণ্ডটা। আমি আর বাঁচবো না–

আমার চোখে তখনো ভাসছে সেদিনের ভয়ংকর দৃশ্যটা।

রোকশানাকে মিলিটারীরা নিয়ে গেলো রাত্রেই। কিন্তু রাতে আর ফেরত দিল না। ফেরত দিয়ে গেলো পরদিন সকালে।

ধর্ষিতা, বিধ্বস্তা রোকশানা। সাইক্লোনে পড়া ডিঙ্গি নৌকার মত ধ্বসে পড়া, ভাঙা, ফুটো। আমার স্ত্রী রোকশানা। বড় আদরের রাকা।

রোকশানাকে নিয়ে আবার পালালাম।

ডাক্তার পি. সি. চক্রবর্তী বললেন, হ্যাঁ আপনার স্ত্রীর কাহিনী তো সব শুনলাম। আপনার কথা যদি সব সত্যি হয়ে থাকে তা হলে এটা নিশ্চয়ই 'সাইকিকের' রোগী। লক্ষণেও তাই মনে হচ্ছে। যাই হোক কামাল সাব, আপনার স্ত্রীকে আমার দেখা দরকার। রোগীর সাথে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ না করে কোন ওষুধ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনি বরং আপনার স্ত্রীকে একদিন আমার চেম্বারে নিয়ে আসুন। কেমন?

স্ত্রীকে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার পি. সি. চক্রবর্তীর চেম্বারে একদিন নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কামাল সাব বিদায় নিলেন।

আমি ছিলাম পাশের চেয়ারেই। আমার দিকে চোখ তুলে ডাক্তার চক্রবর্তী বললেন, কি আলী সাব, শুনলেন তো সবই। কেমন মনে হলো? একে নিয়ে গল্প লেখা যায় না?

ঃ নিশ্চয়ই! আমি সোৎসাহে সায় দিই, আজই আমি এই কাহিনী নিয়ে গল্প লিখবো, দেখবেন।'

'চিত্রালী' ঃ ডিসেম্বর ১৯৭২

সবার উপরে মানুষ সত্য

নাজির সাহেব রীতিমত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন। অমনটি তো আর কোনদিন হয়নি। পত্রিকা চালাচ্ছেন আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর। বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশ, সেই কলকাতায় তার সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক জীবনের শুরু। দেশ ভাগের পর চলে আসেন ঢাকায়। পূর্ব পাকিস্তানে তার 'আবে হায়াত' রীতিমত বেরিয়েছে এবং তারপরে বাংলাদেশেও নিয়মিত বেরুচ্ছে। প্রবীণ সাহিত্যিক বলে নাজির সাহেবের আলাদা একটা মর্যাদাও আছে। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সমাজে নাজির সাহেব সবার শ্রদ্ধার পাত্র।

নাজির সাহেবের তো অমন ভুল হয়নি। দুঃখে ও ক্ষোভে প্রবীণ সাংবাদিক নাজির সাহেবের চোখে পানি আসার জোগার।

আবার টেলিফোন বেজে উঠে–ক্রিং ক্রিং ক্রিং

বিরক্ত ভরেই রিসিভার তুলেন ঃ হ্যালো–জ্বি, আমি সম্পাদক সাহেবই বলছি। হাঁ, হাঁ, এই অভিযোগ আরো কয়েক জনের কাছ থেকেও পেয়েছি–না না, পুরানো ফাইল থেকে ওই লেখা আমরা ছাপিনি–শওকত হোসেনই এই লেখা পাঠিয়ে ছিলেন। কি, কি বল্লেন? না অসম্ভব। শওকত হোসেনের মত 'রাইটার' ইচ্ছাকৃত ভাবে অমন কাজ করতে পারেন না। যাই হোক আমরা লেখকের সাথে যোগাযোগ করছি। পরবর্তী সংখ্যায় নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সব জানতে পারবেন।... ওয়া আলায়কুম সালাম।

রিসিভার রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন নাজির সাহেব।

আশ্চর্য ১৯৪৮ সালে প্রথম আজাদী দিবস বিশেষ সংখ্যা 'আবে হায়াতে' প্রকাশিত শওকত হোসেনের গল্পটি আজ ১৯৭৩ সালের ঈদ সংখ্যাতে গেলো কেমন করে!

শওকত হোসেন প্রবীণ লেখক। বিভাগ পূর্বকাল থেকে নিয়মিত গল্প উপন্যাস লিখে যাচ্ছেন। তাঁর সাথে নাজির সাহেবের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের কথা সাহিত্যিকদের মাঝে তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। এখনো তিনি বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক।

নাজির সাহেবের মনে পড়লো শওকত হোসেন লেখাটা হাতে হাতে দেননি, ঢাকায় থাকলেও তিনি লেখাটা ডাকে পাঠিয়েছিলেন। এবং শওকত হোসেনের নাম দেখে তিনি লেখাটা না পড়েই প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ঃ নূনা লেখাটা একবার পড়া দরকার।–নাজির সাহেব এ কথা মনে করেই টেবিলের উপর থেকে 'আবে হায়াত' খানা হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন।

কলেজ থেকে বাড়ী ফিরছি।

আমার মনে ও কানে কিন্তু তখনো বাংলা স্যারের কথাগুলি গুঞ্জরণ করে চলেছে। পৃথিবীর মানুষ একই ভাগ্য সূত্রে বাঁধা। মানুষ যেখানে যে দেশে যেমন ভাবেই থাকুক, যে কোনও ধর্মাবলম্বী হোক, তার কোনও জাতিভেদ নেই, ধর্মভেদ নেই। সে এক আর অবিনশ্বর।

এই অবিনশ্বরতার কথাই ধ্বনিত হয়েছে অমর বাণীর মধ্যে– শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

রেলওয়ে ক্রসিংটা পার হয়ে জেলা বোর্ডের সড়কে উঠেছি কি, দেখি এদিক-ওদিক তিন দিক থেকে লোকজন দৌড়াদৌড়ি করে মনামরা খালের দিকে ছুটছে।

কৌতূহল ঠেলে নিলো আমায় মানুষের ভিড়ে।

ততক্ষণে পাড়ে লোকসব জড়ো হয়েছে। সবার সোৎসুক দৃষ্টি খালের মধ্যে।

ঃ কি?

ঃ কি হয়েছে?

ঃ খালের মাঝে কি?

মনামরা খালটা বড় বড় উঁচু জার্মুনী পানাতে একেবারে ঠাসা। একদা এই খালটাতে মনা নামক পাগলা এমনি পানাতে আটকে গিয়ে ডুবে মারা পড়েছিলো। সেই থেকে লোকে খালটাকে মনামরা খাল বলে ডাকে।

ঃ খালের পানাতে এমনি কোন দুর্ঘটনা ঘটলো নাকি?

এমন সময় খালের মধ্যিখানে জার্মুনী কতক নড়ে উঠলো।

সাথে সাথে চারিদিক নানা সোরগোল শুরু হলো।

ঃ এই পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে।

ঃ জলদি বাঁশ নিয়ে আয়।

ঃ আরে, ওখানে কি হয়েছে বল না?

দেখতে না দেখতে দু-তিন জন ইয়া বড় বড় বাঁশ নিয়ে খালে গিয়ে পড়লো।

ভিড়ের মধ্য থেকে তখন নানা রকম মন্তব্য ছুটছে।

ঃ একটি মানুষ দৌড়তে দৌড়তে খালের মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছে।

ঃ মিয়া বাড়ির লাল গরুটা জার্মুনী খেতে নেমেছিল– পানিতে আটকে গেছে।

ঃ আরে না-না, গরুও নয় মানুষও নয়– ও একটা পাগল।

এদিকে জার্মুনীর উপর বাঁশ ফেলে দু'জন লোক খালের মধ্যিখানে চলে গেছে।

সবার দৃষ্টি খালের উপরে।

খালের মধ্যখান থেকে জার্মুনীর উপর মাথা তুলে একজন সহসা চীৎকার করে উঠলো ঃ পেয়েছি, পেয়েছি।

সঙ্গীটি সাথে সাথে বলে উঠলো ঃ আরে, এ যে সালামত ধুনকর।

একথা শেষ হতে না হতেই খাল পাড়ের জনতা চীৎকার করে উঠলোঃ ও ব্যাটা তো বিহারী। বিহারীও অবাঙ্গালী। মার শালা বিহারীকে–

ঃ জয় বাংলা।। আকাশ-ফাটা শ্লোগান দিয়ে দেশ প্রেমিক বাঙ্গালী বাঁশ দিয়ে জানজোরে মারতে লাগলো অবাঙ্গালী সালামতকে।

আমি আর দেখতে চাইলাম না। পাশে চোখ ফেরাতেই দেখি, তামাশা-দেখা ভিড়ের মধ্যে

আমার বাংলা স্যারও দাঁড়িয়ে। তাঁর চোখ সজল, পানি টলমল করছে।

আমার সম্পূর্ণ অজান্তেই মনে পড়ে গেলো স্যারের লেকচারটাঃ

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

সম্পাদক নাজির সাহেব চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো। ঠিক এমনি একটি গল্প তিনি বছর বিশেক আগে পড়েছেন বলে মনে পড়ছে। এই গল্পটা ঠিক এই একই ক্যাপশনে–সবার উপরে মানুষ সত্য–শওকত হোসেনই তো লিখেছিলেন।

আশ্চর্য! শওকত হোসেন অমন গর্হিত কাজও করতে পারলেন!

নাজির সাহেব টেলিফোনে আলাপ করতে চাইলেন শওকত হোসেনের সাথে।

ঃ হ্যালো, শওকত হোসেন বাসায় আছেন? আমি আবে হায়াত সম্পাদক বলছি।

ঃ ও নাজির সাহেব নাকি–আসসালামু আলায়কুম। আমি শওকত হোসেন বলছি। কি ব্যাপার বলুন তো?

ঃ আচ্ছা, শওকত সাহেব আপনি এটা কি করলেন? একটা পুরনো, অলরেডি পাবলিশড্ লেখা দিলেন আমাকে, আর এদিকে পাঠকদের কাছ থেকে যে অনবরতই অভিযোগ পাচ্ছি?

ঃ কি বলছেন পুরনো গল্প?–হাসলেন শওকত হোসেন, এখানে তো নতুন কথা, সম্পূর্ণ নতুন তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে আমার গল্পটিতে।

ঃ কী যে বলেন–গল্পের ক্যাপশনটা শুদ্ধ একই অথচ আপনি বলছেন নতুন তত্ত্ব–

ঃ জ্বি। নতুন তত্ত্বই বটে।– টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো শওকত হোসেনের প্রত্যয় দৃঢ় কণ্ঠ। আমি দুঃখিত যে, গল্প লিখে তার আবার ব্যাখ্যাও দিতে হচ্ছে আমাকেই। যাই হোক, আপনার পাঠকদের বলে দেবেন, গল্প দু'টোর ক্যাপশন এক হলেও তার অন্তর্নিহিত ভাব এক নয়।

ঃ তার মানে?

ঃ মানে, ১৯৪৭ সালে যে মানুষটি বাঙ্গালীর হাতে মারা গিয়েছিলো সে ছিল অমুসলিম হিন্দু। আর আজ ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙ্গালীরা যাকে মারছে, সে হিন্দু নয়, মুসলমানও নয়, সে এক অবাঙ্গালী–বিহারী।

'বিচিত্রা' ঃ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩

মুক্তি চাই

এখানেই।

হ্যাঁ, এখানটায়–ঠিক পুলের গোড়াটাতেই বেঁধেছিলো। বাবার সাথে আরো ছিলো জনা আষ্টেক। চুন্টা, ধর্মতীর্থ, রসুলপুর আশপাশ গ্রাম থেকে ধরে-আনা নিরীহ লোক সব।

ঃ আমদের সংগ্রাম–

ঃ চলবে–চলবে।

ঃ কম দামে–

ঃ অন্ন চাই–বস্ত্র চাই।

ঃ খলিল সারের–

ঃ মুক্তি চাই–মুক্তি চাই।

মিছিলটি এগিয়ে গেলো। বাঁশের সাঁকোটি পার হলো।

সাগর তবু দাঁড়িয়ে।

সাঁকোটির এক পাশে সাগর তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

কালিকচ্ছ বাংলাদেশের এক বিখ্যাত গ্রাম। বিপ্লবী নেতা উল্লাস কর দত্তের জন্মস্থান। বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত হিন্দু পরিবারের সুখী আবাস ভূমি। দেশ ভাগের আগে তো খুবই জম-জমাট ছিলো। দত্ত পাড়া, নন্দী পাড়া, কামার পাড়া, বাউরীপাড়া থেকে শুরু করে পশ্চিমে কৈবর্তপাড়া পর্যন্ত কতো যে দালান কোঠা আর সুন্দর-সুন্দর বাড়ি! গাছ গাছালিতে এমন পরিচ্ছন্ন সবুজ গ্রাম বুঝি আর হয় না।

গ্রামের হাই স্কুল–কালিকচ্ছ পাঠশালা। আগের দিনে সকালে বসতো মেয়েদের, বেলা এগারোটা থেকে ছেলেদের। এখন সেদিন আর নেই। এক বেলাই বসে অধুনা। ছেলে মেয়ে এক সাথেই পড়ে। মেয়ে-ছেলের সংখ্যা নিতান্তই নগন্য।

স্বাধীনতার পর রীতিমত স্কুল চলছে। যুদ্ধের সময় কিছুদিন স্কুল বন্ধ ছিল। সে সময়েই একদিন পাঞ্জাবী মিলিটারী বাজার থেকে পাঁচজন হিন্দুকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের মাঝে গোপাল মাষ্টারও ছিল। ওরা পাঁচজন আর ফিরে আসেনি।

গোপাল মাষ্টারের স্মৃতিতে ছেলেরা একটা শহীদ মিনার করেছে স্কুলে। তাদের সাথে সহযোগিতা করেছে খলিল স্যার। অংকের মাষ্টার। আসলে এই স্কুলের বেশ ক'জন ছাত্র মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলো। ওরা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি লোককে সুখী দেখতে চায়। রক্তের বিনিময়ে কেনা স্বাধীনতার সুবিধা বিশেষ কোন গোষ্ঠী বা দলের করতল হতে দেবে না।

স্থানীয় বাজারে ধান-চাউল ও কাপড়ের অগ্নিমূল্য লক্ষ্য করে ছেলেরা যখন একটা ভূখা মিছিল বের করার পরিকল্পনা করছিলো ঠিক তখনই খলিল স্যারকে 'দালাল' আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়। ছেলেরা সব ক্ষেপে যায়। খলিল স্যার পাঞ্জাবী আমলে ক্লাস করেছেন সত্যি কিন্তু 'মুক্তি'রা খুব ভালো করেই জানে, তিনি কোনো রকম দালালী করেননি। তাই স্কুলের

ছেলেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে। দেখতে দেখতে বিরাট মিছিল শ্লোগান দিতে শুরু করে–

ঃ খলিল স্যারের

ঃ মুক্তি চাই– মুক্তি চাই।

ঃ কম দামে–

ঃ অন্ন চাই–বস্ত্র চাই

ঃ আমাদের সংগ্রাম

ঃ চলবে–চলবে।

ঃ খলিল স্যারের–

ঃ মুক্তি চাই– মুক্তি চাই।

সাগরও মিছিলে যোগ দিয়েছে। বই, খাতা-পত্র বগলদাবা করে সেও ছেলেদের সাথে শ্লোগান দিচ্ছে। বাজার, গ্রামের রাস্তা প্রদক্ষিণ করছে।

বাজার ঘুরে মিছিল পশ্চিমে পুরনো বাজারের দিকে এগোয়। বুড়ো ডাক্তারের বাড়ির সামনে দিয়ে আর একটু এগুলেই ছোট্ট খালটা। খালের উপর বাঁশের সাঁকো। সাঁকোর পরে দু'দিকে দু'টি পথ। সামনে প্রসারিত আশ্বিনের মাঠ। ডানে গেলে গলানিয়া, চাঁনপুর গ্রাম। বাঁয়ে রসুলপুর, চুন্টা। মাইল কয়েকের মাঝে কোন জনপদ নেই, শুধু মাঠ। আবাদি জমি।

সাঁকোর কাছে আসতেই সাগরের সব মনে পড়ে। লাইন থেকে বেরিয়ে সে সাঁকোটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ঃ কিরে, তুই ওখানে দাঁড়ালি যে? মিছিলে যাবি নে?

সাগরের মুখে রা নেই।

সাগর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সাঁকোর নীচে–খালের এক বুক পানির দিকে। খালের ময়লা পানিতে কতগুলি স্বচ্ছ ছবি।

আশ্বিনের প্রথম দিক। পঞ্জিকার পাতায় দুর্গাপূজার দিন তারিখ ছিল ঠিকই কিন্তু কালিকচ্ছ গ্রামে পূজার ঘন্টা আর বাজলো না। গোপাল মাষ্টার, জীবেশ ডাক্তারকে ধরে নেওয়ার পর গ্রাম থেকে প্রায় সব হিন্দুই সরে গেছে। শুধু কৈবর্তপাড়ায় ক'ঘর হিন্দু রয়েছে। স্থানীয় শান্তি কমিটি তাদের আশ্বাস দিয়েছে, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর কোন ভয় নেই। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছেন, সংখ্যালঘুদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা যেন দুষ্ট লোকের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়।

তবু সাবধানের মার নেই। কৈবর্ত পাড়ার জেলেরা তাদের মালামাল ও মেয়েদের বাড়ি থেকে সরিয়ে ওই চুন্টা, কুণ্ডা হাওরের মধ্যে যে ছোট গ্রাম, সেখানে সরিয়ে রাখে। কেবল পুরুষেরা থাকে বাড়ি আগলে।

সাগর তখন মা-র সাথে মামার বাড়ি।

সেদিন আশ্বিনের শেষ বিকাল। মাইনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো কালিকচ্ছ গ্রাম,

আশ পাশের গলানিয়া-নওগাঁ-চুন্টা-রসুলপুর।

ব্যাপার কী?

না, জীপে করে মিলিটারী মেজর, ক্যাপটেন ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান যাচ্ছিলেন নাসির নগরের দিকে। কালিরবাজার ছেড়ে একটু উত্তরে যেতেই ঘটে জীপ দুর্ঘটনা। মুক্তি ফৌজ যে কখন রাস্তার নীচে মাইন পুঁতে গেছে কেউ জানে না। ঘটনাস্থলেই নিহত হলো দুজন মিলিটারী অফিসার।

পরদিন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হেড্‌কোয়ার্টার থেকে এলো দলে দলে মিলিটারী। রাজাকার আর দালালদের সহায়তায় ঢুকলো কালিকচ্ছ, ধর্মতীর্থ আর চুন্টা গ্রামে। দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে উঠলো পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িগুলিতে।

নারায়ণ দাস, মানে সাগরের বাবা মিলিটারীর কথা শুনেই বাড়ি ছেড়ে দৌড় দেয় পশ্চিমে। খাল সাঁতরে পার হয়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চুন্টার দিকে। সাগরের বাবা একা নয়– কৈবর্তপাড়ার আরো ক'জন।

সাগর এ দৃশ্য নিজে দেখেনি শুনেছে পরে।

কিন্তু তারা কেউ মাঠ পার হয়ে যেতে পারেনি। বন্দুকের গুলী ওদের ফেলে দেয় জমিতে। শিকারী যেমন করে পাখী শিকার করে, বাঙ্গালী-শিকারী এই নর-পশুরা পলায়নপর মানুষ ক'জনকে গুলী করে তেমনি আহত করলো। তারপর দৌড়াদৌড়ি করে মাঠ থেকে কুড়িয়ে আনলো।

কুড়িয়ে জড়ো করে মানুষগুলিকে বাঁধলো। বাঁধলো এই সাঁকোর খুঁটির সাথে।

এখানে, এখানটায়।

সাগর দেখেনি, শুনেছে। শুনেছে প্রত্যক্ষদর্শী ক'জন মুসলমানের মুখে।

তখন বেলা বিশেষ নেই। আশ্বিনের সূর্য্য হেলে পড়েছে মেঘনার উপর। লাল হতে শুরু করেছে পশ্চিমের আকাশ।

বাংলাদেশের রাতকে মিলিটারী জবর ডরায়। রাতের অন্ধকারে 'মুক্তিরা' যে কখন কোথা দিয়ে আক্রমণ করে বসে বিশ্ব বিখ্যাত এই ঝানু সৈন্যরা কোন কিছু ঠাহরই করতে পারে না। তাই সন্ধ্যার আগেই ওদের ক্যাম্পে ফিরতে হয়।

একজন সৈনিক চেঁচিয়ে উঠে ঃ এই শালা লোক, তুম্ কিয়া মাংতা?

মানুষগুলোর মাঝে সাগরের বাবাই কম আহত হয়েছে। সে আবার কিছু লেখাপড়াও জানে। উর্দু না বলতে পারলেও কিছু কিছু বোঝে। সে-ই সবার পক্ষ থেকে জবাব দেয়।

ঃ আমরা মুক্তি চাই।

বাঘের মত গর্জন করে উঠে সৈনিক ঃ কেয়া?

নারায়ণ দাসের সাথে সবাই সমস্বরে বলে উঠে ঃ আমরা সবাই মুক্তি চাই সাহেব, মুক্তি।

ঃ কেয়া? তুম্ মুক্তি?

ঃ আজ্ঞে, আমরা মুক্তি চাই।

ঃ ঝুট বাত বলতা?

ঃ না-না সাহেব, সত্যি আমরা মুক্তি চাই–মুক্তি–

সাথে সাথে গর্জে উঠে পাঞ্জাবী বন্দুক–গুড়ুম–গুড়ুম–

পাঞ্জাবী সৈন্যের গুলী চিরতরে স্তব্ধ করে দিলো ক'টি বাঙ্গালী কণ্ঠ।

কিন্তু মুক্তিকামী বাঙ্গালীর অন্তিম প্রার্থনা 'আমরা মুক্তি চাই–মুক্তি' তখনো ইথারে ইথারে ঢেউ তুলে আশ্বিনের আকাশকে বিষাদ করে তুলেছে।

ম্লান মলিন দিনমণি শোক বিহবল হয়ে ধীরে ধীরে অস্তাচলে মুখ লুকায়।

ঃ মুক্তি চাই– মুক্তি–

সাগরের কানে পষ্ট ভেসে এলো তার বাবার কণ্ঠস্বর। সে আরো মনোযোগী হয়ে শুনবার চেষ্টা করলো। আরো উৎকর্ণ হলো।

ঃ মুক্তি চাই– মুক্তি–

হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবার কণ্ঠস্বরই তো। কতো চেনা, কতো আপন এ কণ্ঠ। সাগরের ভুল হবার কথা নয়। এ যে তার বাবার কণ্ঠঃ মুক্তি চাই– মুক্তি–

ঃ কিরে সাগর, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? দেখছিস না মিছিল যে পুল পার হয়ে গেছে?

সহপাঠী সামসুর ডাকে সম্বিত পায় সাগর। চোখ তুলে দেখে মিছিল সাঁকো পার হয়ে সামনের দিকে চলেছে। মিছিলে ছেলেদের শ্লোগান চরমে উঠেছেঃ মুক্তি চাই– মুক্তি চাই।

সাগরের মনে হলো এক বছর আগে এখানে তার বাবার কণ্ঠ থেকে যে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছিলো, তা–ই যেনো ছেলেদের কণ্ঠে হাজার শ্লোগান হয়ে উৎসারিত হচ্ছে ঃ মুক্তি চাই–মুক্তি চাই।

বাবার কণ্ঠ, বাবার স্মৃতি সাগরকে ঠেলে নিলো সামনে।

সাঁকোটা পার হয়ে দৌড় দিল সে মিছিলে–

ঃ কম দামে–

ঃ অন্ন চাই–বস্ত্র চাই।

ঃ খলিল স্যারের–

ঃ মুক্তি চাই–মুক্তি চাই।

মুমূর্ষু বাবার অন্তিম বাসনা যেন পুত্রের হৃদয়ে সঞ্চারিত হলো।

ঃ মুক্তি চাই– মুক্তি চাই।

সূর্য্যের আলোকণারা এ শ্লোগান ছড়িয়ে দিলো বাংলার নির্মেঘ আকাশে বাতাসে ঃ মুক্তি চাই–মুক্তি চাই–

মিছিল এগিয়ে চলে।

'মনন' ঃ ডিসেম্বর, ১৯৭৩

সব ঝুট বাত্

সেদিন বাংলাদেশের সকল কাগজেই সচিত্র সংবাদটি দেখেছেন। দেখেছেন, মেঘনা নদীর উপর অবস্থিত ভৈরব রেল সেতুটির পুনর্নির্মাণের পর তার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। সেই শুভ দিনটির নানা সরস চিত্র ও রসাল বর্ণনা নানা কাগজে, বেতার-টেলিভিশনেনানাভাবেপ্রচারিত হয়েছে। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক দিনের শুভ মুহূর্তটিতে যে একটা অশুভ ঘটনাও ঘটেছিলো তার কথা কিন্তু কেউ প্রকাশ করেননি।

আমি সেই অশুভ ঘটনাটিই আপনাদের বলছি।

ইয়া উঁচু রেলসড়কের উপর মেঘনা পুলটির ঠিক দ্বারদেশে সুন্দর আকর্ষণীয় এক 'গেইট' তৈরী করা হয়েছে। সেই ফটকের সামনে টকটকে লাল ফিতা দু'হাত প্রসারিত করে 'প্রবেশ নিষেধ' ঘোষণা করছে। প্রধান অতিথি সে ফিতা কেটে পুনর্নির্মিত সেতুটির দ্বারোদঘাটন করবেন।

সড়কের মানে উচু রেল লাইনটির দুপাশেই কাঁটাতারের শক্ত বেষ্টনী। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী সকাল থেকে পাহারা দিয়ে জায়গাটার গুরুত্ব অসীম করে তুলেছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন কাউকে বেষ্টনীর ভিতর ঢুকতে দিচ্ছে না।

আশ্বিনের কড়া রোদ পশ্চিমে একটু হেলেছে, সুসজ্জিত স্পেশাল ট্রেনটি ধীরে ধীরে মেঘনা পুলের দ্বারদেশে এসে হাজির হলো।

রেল লাইনের দু'পাশে হাজার হাজার উৎসুক জনতা। জনতা নীচে, রেলওয়ে কলোনীর বাসা, বারান্দা, ছাদে। জনতা অদূরে ভৈরবপুর গ্রামের সদর রাস্তা, দালানের উপর, জনতা ওই পাশে মালগুদাম শেডের আনাচে কানাচে, মনা-মরা খালের উপর ভাসমান নৌকার ছইয়ে। মেঘনার কালো পানির উপর বিচিত্র রংয়ের পাল-তোলা নৌকাগুলিও তার বৈঠা রেখে সোৎসুকে তাকিয়ে আছে পুলটির দিকে– এই বুঝি তার শুভ উদ্বোধন হলো। চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। আহা, অমন সুখের দিন মেঘনা পাড়ে আর আসেনি বুঝি কোনদিন।

সব উত্তেজনা ঔৎসুক্য ও অধীর আগ্রহকে সতেজ করে প্রধান অতিথি বিশেষ গাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। সাথে সাথে পটাপট মুভি ক্যামেরাগুলি সক্রিয় হয়ে উঠলো, পুলের উপর রেল লাইনের ট্রলিতে' স্থাপিত টেলিভিশনের ক্যামেরা সচল হলো, মাথার উপর উঠলো সাংবাদিকদের বিভিন্ন সাইজের ছবি তোলার যন্ত্রপাতি।

প্রধান অতিথি ধীরে ধীরে সুসজ্জিত তোরণের দিকে এগিয়ে যান। টকটকে লাল ফিতাটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সবাই স্থির দাঁড়িয়ে ফিতা কাটার শুভক্ষণটি গুণছে।

কে একজন যেন কোরান তেলাওয়াত করলেন। প্রধান অতিথি পাশে দণ্ডায়মান রেলকর্মচারীর ট্রে থেকে সুন্দর কাঁচিখানা হাতে তুলে নিলেন। স্থানীয় লীগনেতা মাইকের সামনে গিয়ে বললেন, আজ ভৈরবের তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমার মনে পড়ছে, পাক বাহিনীর নিষ্ঠুর নরপিশাচ পশুরা–

ঃ সব ঝুট বাত– সব মিথ্যা। সব পাঞ্জাবীই খারাপ না, সব বাঙালীই ভালা না।

মাইকের কথা শেষও হলো না, একটা লোক কেমন করে জানি পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাঝখান দিয়ে ছুটে এলো গেইটের দিকে।

সবাই হকচকিয়ে গেলো। এই অভূতপূর্ব ঘটনার আকস্মিকতায় সবার শ্বাস প্রশ্বাসও যেন ক্ষণিকের তরে বন্ধ হয়ে রইলো। দৌড়ে এলো হালিম, দৌড়ে আসে আওয়ামী নেতৃবৃন্দ।

ঃ এর মাথা খারাপ স্যার, পাগল।

ঃ আরে, ও তো আমাদের 'মরম পাগলা'।

স্থানীয় নেতৃবৃন্দ মরম পাগলাকে ধরে জোর করে সেখান থেকে সরাতে যায়।

ঃ মনে রাখবেন সার, সব পাঞ্জাবীই খারাপ না, সব বাঙালীই ভালা না।

ঃ চুপ কর বলছি! আবার জোর দেখাস? মেরে মাথা গুড়িয়ে দেবো কিন্তু!

ঃ হি হি।– মরম পাগলা হাসতে লাগলো। কি, কইছিলাম না, সব পাঞ্জাবীই খারাব না সব বাঙালীই ভালা না? তুইতো বাঙালী– তুই আমারে মারতে চাস। আর পাঞ্জাবী আমারে জানে বাঁচাইছে। জানস?

মরম পাগলাকে দু'জন পুলিশ ধরে একেবারে রেল লাইনের নীচে নিয়ে গেলো।

এদিকে প্রধান অতিথি 'বিছমিল্লাহ' বলে লাল ফিতা কাটলেন। মেঘনা পুলের শুভ উদ্বোধন হলো। সুসজ্জিত ইঞ্জিনটি স্পেশাল ট্রেনটিকে নিয়ে ধীরে ধীরে পুনর্নির্মিত মেঘনাপুলের উপর দিয়ে আশুগঞ্জের দিকে চললো।

আমি আর আশুগঞ্জে গেলাম না।

সাংবাদিক হিসাবে আমার বিশেষ নিমন্ত্রণ ছিল। আমি কাঁটাতারের বেষ্টনীর ভিতরেই ছিলাম। মরম পাগলার কথাগুলি আমার প্রাণে বড় লাগে। ও অমন কথা বলে কেন? ব্যাপার কি?

মরম পাগলার খোঁজে আমি মেঘনাপুলের উঁচু সড়ক ছেড়ে নিচে চললাম।

১৯৭১ সালের জুলাই মাস। পোড়া বিধ্বস্ত বাজারটিতে আবার ধীরে ধীরে দোকান পাট বসতে শুরু করেছে। ভাঙা বন্দরের আশপাশের গ্রামগঞ্জের লোকেরা 'আল্লাভরসা' করে নিজ নিজ পরিত্যক্ত বাড়ীঘরে ফিরে আসছে। গ্রামে বাজারে তথাকথিত 'শান্তি কমিটি' গড়ে তোলা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের আর আর স্থানের মতো ভৈরব বাজারেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য পাকিস্তানী সৈনিকরা বাঙ্গালী রাজাকারদের সহায়তায় অস্বাভাবিকভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে। গ্রামে-বন্দরে, এখানে সেখানে 'দুষ্কৃতিকারী ও মুক্তিফৌজ' মিথ্যা আবিষ্কার করে নিরীহ বাঙ্গালী জীবনকে দুঃসহ ও দুর্বহ করে তুলেছে।

তিন মাস বাইরে বাইরে ঘুরে মহরম আলী আবার নিজ বাড়ীতে ফিরে এসেছে। বাজারে নিজ গদী পেতে বসতেও হয়েছে। না খুলে উপায় নেই। ক্যাপটেন সালামতউল্লাহ জরুরী এলান জারি করে দিয়েছেন, সাতদিনের মধ্যে নিজ নিজ দোকান পাট খুলে না বসলে ঘরে আগুন দেওয়া হবে। গদী বলতে শুধু ঘরটাই। ঘরের আসবাব পত্র থেকে শুরু করে মালপত্র সব লুট হয়ে গেছে। শুধু মহরম আলীই নয়– ভৈরব বাজারের সকল মার্চেন্ট এরই এই একই দুর্দশা।

একেই বুঝি বলে, দিনে বাদশা, ফকির সন্ধ্যাবেলা। প্রথম দিন বাজারে গিয়ে মহরম আলী

তো রীতিমত ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল। বাজারের অলি গলি কোনখানে কোন জন মনুষ্যি নেই। এমনকি একটা কুত্তাও তার নজরে পড়লো না। সব খালি। খাঁ খাঁ করছে একদিনের জমজমাট ভৈরব বাজার। সিনেমা হলের সামনে থেকে শুরু করে নদীর পাড় সমস্ত গোলা গুদাম পুড়ে মাটির সাথে মেশানো। তেমনি দগ্‌দগে পোড়ার বিষাদময় কালো দাগ রাণীরবাজার, চক বাজার, গুড়পট্টি, মিষ্টিপট্টি, চাউলপট্টি, সর্বত্র-সর্বত্র।

চারিদিকে ভগ্নস্তূপ। পোড়াবাড়ীর ভগ্নস্তূপের মৃত শ্মশানপুরীতে মহরম আলীই যেন একটা সজীব, জীবন্ত প্রাণী। মহরম আলী ভয়ে বিস্ময়ে এই অগ্নিদগ্ধ ভগ্নস্তূপের মাঝে একা দাঁড়িয়ে মনে মনে আল্লার কাছে ফরিয়াদ করলো, ইয়া আল্লাহ আলেমুল গায়েব রাব্বুল আলামিন, যারা এমন সাজানো সোনার বাজারটিকে ধ্বংস করে মাটি করে দিলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করেছো? বেসেছ ভালো?

হঠাৎ তার কানে এলো এক বিকট চীৎকার ঃ ইয়ে– তুম কোন্ হো?

পেছনে ফিরে দেখে দু'তিন জন মিলিটারী বন্দুক উঁচিয়ে পুবদিক থেকে গট্‌গট করে তার দিকে আসছে।

মহরম আলী ভয়ে একেবারে জমে গেল। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোন রা-ই বার হচ্ছে না। বিশেষ সে তো হিন্দি বা উর্দ্দু কোনটাই বলতে পারে না। যদিও বুঝতে পারে কিছু কিছু। কিন্তু এখন জবাব দেয় কিভাবে?

ভয়ে কাঁপতেই থাকে। সে শুনেছে, পাকিস্তানী সৈন্যরা বাঙালীকে ধরে ধরে পাইকারী ভাবে গুলী করে মারছে।

ঃ ইয়ে বাতাও– তুম কোন হো? মিলিটারী তার কাছে চলে এসেছে।

মহরম আলী নিরুপায় হয়ে 'দোয়ায়ে ইউনুস' পড়তে লাগলো। এ ছাড়া তার কিইবা করার আছে। সে কে? মুসলমান? বাঙালী? কোন্ জবাব পেলে ওরা খুশী হবে?

ঃ আরে দোস্‌ত ঠারো।

চোখ তুলে দেখে তিনজন বাঙালী রাজাকার এদিকে আসছে। কাছাকাছি হতেই মহরম আলী চিনতে পারে। দক্ষিণ পাড়ার ফারুক, কুতুব আর সেলিম। এখন রাজাকার কমাণ্ডার।

রাজাকার হলেও পরিচিত চেনা মানুষ পেয়ে মহরম আলী একটু স্বস্তি বোধ করলো। ডুবন্ত মানুষের কাছে খড় কুটাও কম আশ্রয় নয়।

ঃ সেলিম মিয়া, আমারে বাঁচাও! প্রায় কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে মহরম আলী বলে উঠে।

ঃ আরে দোস্‌ত এত ভি হামারা লোক। – সেলিম মিলিটারীকে বোঝায়, মহরম আলী হামারা গাওকে মানুষ। খুব পাক্কা আদমী। খাস পাকিস্তানী হ্যায়।

মিলিটারী মহরম আলীর পরিচয় পেয়ে শান্ত হয়।

এভাবে প্রথম ফাঁড়াটি কাটে।

কিন্তু মহরম আলী কি জানতো যে এর চেয়ে বড় ফাঁড়া তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মিলিটারী ক্যাম্প নদীর ওপার আশুগঞ্জে। ওখান থেকে মেঘনা পুলের উপর দিয়ে হেঁটে,

কখনও বা টেনে আসা যাওয়া করে মিলিটারী। এ পাড়ে গড়ে উঠেছে রাজাকার ক্যাম্প, আশপাশের বাঙালীদের নিয়ে।

কথা নেই বার্তা নেই, একদিন সকালে মহরম আলীর বাড়ীতে মিলিটারী এসে হাজির। পেছনে রয়েছে রাজাকার কমাণ্ডার ফারুক। মিলিটারী প্রথম জানতে চায়, তার ছেলে মোস্তফা কোথায়? মহরম আলী ভয়ে কাচুমাচু হয়ে জানায় যে, মোস্তফা বাড়ীতে নেই এবং কোথায় আছে তাও সে জানে না।

ঃ সব ঝুট বাত্। মিলিটারী বজ্র নির্ঘোষে বলে– জলদি সহি বাত বুলাও।

ঃ না সাব, সত্য কথাই কইতাছি। মোস্তফা কোনখানে আমি জানি না।

ঃ নেহি, নেহি। তোমারা লাড়কা মুক্তি আছে– হুম।

বড় আশা করে মহরম আলী এবার ফারুকের দিকে তাকায়– ফারুক, তুমি ওদের বুঝিয়ে বলো না।

কমান্ডার ফারুক এগিয়ে এলো সামনে। মহরম আলী বরাভয়ের দৃষ্টিতে স্বস্তি পেতে চায় মনে।

ঃ দেখেন মহরম আলী মিয়া, মিলিটারী সাবরা খোঁজ খবর লইয়া আইছে। ফারুক বলে, আপনি খামখা মিথ্যা কথা বইল্যা বিপদ ডাইক্যা আনবেন না।

ঃ ওমা– ওমা, ফারুক! তুমিও? – মহরম আলীর মাথায় যেনো আসমান ভেঙে পড়ে। ফারুক, তুমিও এই কথা কইতাছ?

ফারুক মাথা নীচু করে বলে, আমার তো কোন কিছু করার নাই– আমি অর্ডার পালন করতাছি শুধু। আমি মোস্তফার বাড়ীটা চিনাইতে আইছি।

মহরম আলী হঠাৎ বোবা হয়ে গেলো। খানিক নীরবতা। এই সংকট মুহূর্তে বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো মহরম আলীর মনের আকাশে ভেসে উঠলো তার বড় ছেলে, স্থানীয় কলেজের ছাত্র মোস্তফার মুখটি। আগরতলা যাওয়ার আগে বলেছিলো ঃ আব্বা, আমি চললাম। আপনি সাবধানে থাকবেন। আমার জন্য আপনারও বিপদ হতে পারে।

ঃ ইয়ে গিদ্দর– জলদি বুলাও।

মহরম আলী আমতা আমতা করে বলে, সত্যি কইতাছি, সাব, আমি মোস্তফার কোন খবরই জানি না।

ঃ সব ঝুট বাত্। – একটু থেমে মিলিটারী আবার বলেছিলো, ঠিক হ্যায়– ইসকো পাক্ড়ো।

মিলিটারীরা মহরম আলীকে ধরে আশুগঞ্জের ক্যাম্পে নিয়ে গেলো।

সবাই জানে, এমনকি মহরম আলী নিজেও জানতো মিলিটারীরা যাদের ধরে আশুগঞ্জের ক্যাম্পে নিয়ে যায়, তাদের কেউ আর কোন দিন ফিরে না।

অথচ কি আশ্চর্য, মহরম আলী নিজেই ফিরে এসেছে। অমন অসম্ভব ব্যাপারও যে সংসারে অন্ততঃ বাংলা মুক্তি সংগ্রামকালে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটতে পারে, নিজের জীবনে না

ঘটলে মহরম আলীও কোনদিন তা বিশ্বাস করতো না।

ভাবতে সত্যি অবাক লাগে, কি অদ্ভুতভাবেই না তা ঘটে গেলো।

আশুগঞ্জের সাইলোর গুদাম ঘরে অনেক বাঙালীকেই বন্দী করে রেখেছে। মহরম আলী তাদের কাউকেই চেনে না। কুলিয়ারচর, বাজিতপুরের লোকই বেশী। রাত্রি হলেই একজন সেপাই দরজার সামনে দাঁড়ায় এবং একে একে নাম ধরে ডাকতে থাকে। দশ-বারো জন হলেই তাদের বেঁধে গুদাম ঘর থেকে নিয়ে যায়। সবাই জানে, ওরা আর ফিরে আসবে না।

বন্দীদের নিয়ে যাওয়ার আধ ঘন্টা খানেক পরেই রাত্রির আকাশ চিরে পট্ পট্ ক'টি এল্ এম্ জি-র ভয়াল শব্দ উঠে। সাইলোর গুদাম ঘরের বন্দীরা বুঝতে পারে আশুগঞ্জের চরে বা মেঘনার পুলের উপর আজ আরো ক'টি বাঙালী খতম হলো।

ভয়ে বিবর্ণ বন্দীরা শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দেয়ালের দিকে উদাসীন দৃষ্টি মেলে গুটিসুটি মেরে বসে থাকে।

পরদিন সকালে মহরম আলীকে ক্যাপটেন সালামতউল্লাহর ঘরে নিয়ে গেলো। ক্যাপটেন তাকে মুক্তিফৌজের সঠিক খবর দিতে বললেন। মহরম আলী তার অক্ষমতার কথা জানাতেই ক্যাপ্টেন হুংকার দিয়ে উঠেন– ইয়ে সব ঝুট বাত্। সহি বাত বুলাও।

সাথে সাথে চললো মহরম আলীর উপর দৈহিক নির্যাতন। বুটের লাথি, ডাণ্ডার বাড়ি থেকে শুরু করে শেষমেষ ইলেকট্রিক শক্।

মহরম আলী বেহুঁস হয়ে পড়লে সেপাইরা তাকে টেনে হিঁচড়ে গুদাম ঘরে ফেলে দিয়ে গেল।

তিনদিন একই জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতনের পর ক্যাপটেন মহরম আলীকে গুলী করে মারার অর্ডার দিলেন।

মিলিটারীর এই অকথ্য, অসহ্য নির্যাতন থেকে বাঁচবার পথ পেয়েছে শুনে, বন্দুকের গুলীতে একবারে মরে যাওয়াটাকেই মহরম আলী আল্লার রহমত বলে মনে করলো।

সেদিন রাত দশটা এগারটা হবে। দশজন বন্দীর প্রত্যেকের দু'হাত একত্রে শক্ত করে বেঁধে সাইলোর গুদাম ঘর থেকে বার করা হলো।

সামনে মিলিটারী হাবিলদার। পেছন পেছন সারিবদ্ধভাবে হেঁটে চলেছে দশজন অসহায় বন্দী বাঙালী। সবার পেছনে মহরম আলী। তার পেছনেই একজন পাঞ্জাবী সেপাই হাতে এল, এম, জি।

আকাশে চাঁদ নেই। কিন্তু অগনন তারকারাজি উপর থেকে তাকিয়ে আছে নীচে। বিশ্বচরাচরের অনন্তকালের অমর সাক্ষী তারকাগুলি উপর থেকে দেখছে, আধো আঁধারের ভিতর দিয়ে মহরম আলীদের নিয়ে যাচ্ছে বধ্য ভূমিতে– মেঘনার উঁচু পুলের উপরে।

এক সময় তারা মেঘনা পুলের ফুটপাতের উপর পা রাখলো। আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকার কথা টের পেয়েই যন্ত্র-দানব, নিষ্প্রাণ লৌহ-নির্মিত সেতুটি ভয়ে শিহরিত হয়ে উঠলো। আর

সাথে সাথে কেঁপে কেঁপে উঠলো মেঘনার বিরাট পুলটি।

মহরম আলী শেষ বারের মতোন একবার ডানে, বাঁয়ে ও নীচে তাকালো। ডানে আশুগঞ্জ বাজার,বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র। সব অন্ধকারে বিলীন।

যুদ্ধের সময় বলে 'ব্ল্যাক আউট' চলছে সর্বত্র। বাঁয়ে ভৈরব বাজারটিকে আবছা আবছা দেখা যায়– বহুদূরে স্বপ্নে দেখা ভাঙা, বিজন বাড়ীর মতো মনে হচ্ছে। নীচে, মেঘনার নিস্তরঙ্গ কালো পানিতে আকাশের হাজার তারকা। রাতে নৌকা চলাচল নিষিদ্ধ মাস ধরেই।

মেঘনা ব্রীজের ফুটপাত দিয়ে ওরা এগিয়ে চলে সামনে। সবার আগে মিলিটারী হাবিলদার। তার পেছনে দশজন বন্দী, সবার পেছনে মহরম আলী। আর বন্দীদের পেছনে একজন সেপাই। মেঘনার পুলের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে মহরম আলীর মৃত্যুর কথা মনে হলো না– মনে পড়লো অন্য একটি কথা। মেঘনার পাড়েই তার বাড়ী। ১৯৩৫ সালে যখন মেঘনা পুলটি তৈরী হতে থাকে, তখন মহরম আলী অনেক ছোট। তার চোখের সামনেই অতো বড় পুলটি ধীরে ধীরে তৈরী হলো। তারপর কতো দিন, কতো মাস, কতো বছর পার হয়ে গেলো। সে মেঘনা পুলটিকে দূর থেকে দেখেছে, প্রয়োজন মতো গাড়ী চড়ে এই পুলটি পার হয়েছে। কিন্তু কোনদিন, হ্যাঁ, কোনদিন তো বাড়ীর কাছের এই পুলটির উপর উঠেনি। কোনদিন তো এর ফুটপাত দিয়ে হাঁটেনি। এমন কি পুলের উপর দিয়ে হাঁটার কথা কল্পনাও করেনি মহরম আলী।

মানব ভাগ্যের কি অদ্ভুত লীলা। আজ সেই ফুটপাত দিয়েই মহরম আলী হাঁটছে। হাঁটছেনা ঠিক, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মহরম আলী আপন চিন্তায় বিভোর হয়েই হাঁটছিল। এমন সময় পেছনের সেপাইটি তার হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করলো। মহরম আলী হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় কাত করে সেপাইটির দিকে তাকায়।

নিঃশব্দ রাত্রির এই আধো আলো, আধো ছায়াতেও মহরম আলী স্পষ্ট দেখতে পেলো, সেপাইটি তাকে ইশারা করছে,এই বোকা লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে যা।

মহরম আলীর সমস্ত শরীর অজানা ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।

অন্যান্য বন্দীরা সবাই ধীরে ধীরে চলেছে।

মহরম আলী ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে চাইলো। সে ভাবতে চেষ্টা করলো, সেপাইটি কি তাঁকে বাঁচাতে চায়? সত্যি? কিন্তু কেন? সেপাইটি তো পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবী হয়ে একজন নিরীহ বাঙালীকে বাঁচাতে যাবে কেন?

ততক্ষণে তারা সবাই তিনটি গার্টার পার হয়ে মেঘনার মাঝামাঝি জায়গায় এসে গেছে।

পেছনের সেপাইটি এবার সত্যি সত্যি মহরম আলীকে দু'হাতে ধরে ফেললো। একটি মুহূর্ত মাত্র। বাকী বন্দীরা হাবিলদারকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে পা ফেলে এগুচ্ছে। মহরম আলী ব্যাপারটা বুঝবার অবকাশ পেলো না। পাঞ্জাবী সেপাইটি হঠাৎ তাকে দু'হাত দিয়ে ডান দিকে ধাক্কা দিলো। লোহার স্পেনের এক ফাঁক দিয়ে মহরম আলী টুপ করে পড়ে গেলো নীচে, মেঘনার কালো শীতল পানিতে।

দু'হাত বাঁধা অবস্থায় অতো উচু থেকে পানিতে পড়ার পর যখন মহরম আলী ভেসে উঠেছে, তখন তার কানে আসে কতটি বুলেটের শব্দ আর ভারী জিনিষ পানিতে পড়ার ঝুপ-ঝাপ আওয়াজ।

হাত বাঁধা অবস্থাতেই পা দিয়ে সাঁতরিয়ে মহরম আলী মেঘনার ঠাণ্ডা পানিতে ভেসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো।

মেঘনার প্রবল স্রোত তাকে টেনে নিয়ে চললো দক্ষিণে। ক্লান্ত শ্রান্ত মহরম আলী অবশেষে শুধু নাক-মুখ পানির উপর রেখে মরার মতো চিৎ হয়ে ভাসতে থাকলো। শীতে ঠাণ্ডায় তার দেহ অবশ হয়ে আসতে চাইলেও সে মনকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করতে লাগলো। এই দারুণ বিপদের মাঝেও তার এই একটি চৈতন্য বারে বারে তাকে সাবধান করে দিচ্ছিলো পাঞ্জাবীর গুলী যখন তাকে বিদ্ধ করেনি এখন আপন মনের জোরেই সে বাঁচতে পারবে। আর বাঁচবার দুর্মর আকাঙ্ক্ষাতেই মহরম আলী পানির উপর ভেসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো।

কত সময় পার হয়ে গেছে মহরম আলী বলতে পারবে না, হয়তো এরি মধ্যে কোন সময় তার সংজ্ঞা লোপ পেয়েও থাকবে। এক সময় তার মনে হলো, তার মাথায়, গায়ে যেন কিসের মৃদু আঘাত লাগছে। কনুই দিয়ে নাড়াচাড়া করতেই মহরম আলী বুঝতে পারে সে এক পাট ক্ষেতের মধ্যে এসে পড়েছে।

সাহস করে পা দিয়ে নীচের দিকে নামতেই পায়ে মাটি ঠেকে। পাট ক্ষেতের মধ্য দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হতে এক সময় অদূরে আলো দেখতে পেলো। সে আলো অনুসরণ করে করে মহরম আলী একটি ঘরের পাশে গিয়ে উপস্থিত হলো। নদীর পাড়েই ঘরখানা। ঘরের ভিতর বাতি জ্বলছে।

মহরম আলী কোন মতে টেনে নিস্তেজ দেহখানাকে আধো পানি আধো মাটিতে রাখে। শুকনো মাটির স্পর্শ পেয়েই মহরম আলী জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

সব শুনে আমি একজনকে বললাম, আচ্ছা মহরম আলী তো শেষ পর্য্যন্ত বেঁচে গেলো- তা'হলে মাথা খারাপ হলো কেমন করে?

ঃ সে আরেক কাহিনী সাহেব। - কে একজন পাশ থেকে বলে, সে কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন।

মহরম আলী নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বর থেকে বেঁচে উঠে আর বাড়ীমুখো হয়নি। খবর পাঠিয়ে তার বৌ ঝিদের সরিয়ে নেয় বাড়ী থেকে। আবার শুরু করে যাযাবর জীবন। এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম। এক আত্মীয় বাড়ী থেকে আর এক আত্মীয় বাড়ী।

আর ঠিক এ সময়েই ঘটে আসল দুর্ঘটনাটা।

মহরম আলীর ছেলে মোস্তফা আগরতলা থেকে কেমন করে জানি শুনতে পায় যে, তার আব্বাকে মিলিটারীরা ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে।

মোস্তফার ছিলো গেরিলা ট্রেনিং। সে অপারেশনের নাম করে ভৈরব আসে। উদ্দেশ্য মা ও ছোট ভাই-বোনদের খোঁজ নেওয়া।– আব্বার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া।

কিন্তু কোনটাই তার আর হয় না। রাজাকার কমাণ্ডার ফারুক গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মহরম আলীর বাড়ীতে লুকিয়ে থাকে। গভীর রাতে মোস্তফা যখন তার বাড়ীতে গেছে, কমাণ্ডার ফারুক তাকে গুলী করে মারে।

এই দুর্বিসহ দুঃসংবাদটি পাওয়ার পর থেকেই মহরম আলী কেমন জানি স্তব্ধ হয়ে যায়। কারো সাথে বিশেষ কথা বলে না, চুপ চাপ একা একা থাকে আর আনমনে বিড় বিড় করে কি যেন বলে।

এর কিছু দিন পরই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হলো। কিন্তু আশ্চর্য, স্বাধীনতার পর যখনই কোন নেতা কোন জনসভায় মাইকের সামনে গলা ফাটিয়ে বলেছে – অত্যাচারী নরপিশাচ, বর্বর পাঞ্জাবী পশুরা আমার বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তিরিশ লক্ষ বাঙ্গালীকে হত্যা করেছে– মহরম আলী অদূর থেকে চীৎকার করে প্রতিবাদ করে বলেছে, না–না, সব ঝুট। সব মিথ্যা। সহি বাত্ বুলাও– সত্যি কথা বলো।

ঃ সবচে' আশ্চর্য কি জানেন সাহেব? এখনো কেউ তার সামনে পাঞ্জাবীদের নিন্দা, পাঞ্জাবীদের কুৎসা বলতে পারে না। তার কানে পাঞ্জাবীর নিন্দার কথা গেলেই মহরম আলী অর্থাৎ এই 'মরম পাগলা' চেঁচিয়ে উঠবে– না–না, সব ঝুট বাত্। সব মিথ্যা। সব পাঞ্জাবীই খারাপ না, সব বাঙ্গালীই ভালা না।

অধুনা আমি আর কোন জনসভাতে যাই না। জনসভা দেখলেই আমার 'মরম পাগলা'র কথা মনে পড়ে যায়। তখন বক্তার কোন কথাই আমার কানে আর যায় না। আমার কানে তখন অনবরত বাজতে থাকে 'মরম পাগলা'র কথা ক'টি–

সব ঝুট বাত্– সব মিথ্যা।

গণবাংলা' ঃ ৯ই নভেম্বর, ১৯৭৩

আমি মরি নাই

এখন ইলেকশন অফিসার–টু'র অফিসে গেলেই সবার সাথে দেখা হয়। সবাই মানে বন্ধু-বান্ধব, চেনা, আধাচেনা শহরের নির্দিষ্ট আয়ের কর্মচারীবৃন্দ। আর একটু নরম ও সুখশ্রাব্য করে বললে, নির্দিষ্ট আয়ের শিক্ষিত অফিসারগণ।

ইলেকশন শেষ হয়ে গেলেও সদাশয় সরকার ইলেকশন অফিস তুলে দেননি। সরকারের বিভিন্ন রকম কাজ করছেন আজকাল এই ইলেকশন অফিসারগণ। আমাদের শহরে আবার দু'জন অফিসার। পদের দিক দিয়ে প্রথম হলেও লোকে কিন্তু ইলেকশন অফিসার ওয়ানকে বিশেষ চেনে না, সবাই চেনে ইলেকশন অফিসার টু-কে। কারণ তিনি হচ্ছেন, ন্যায্যমূল্যের জিনিষপত্রের কর্তা। ন্যায্যমূল্যে সাবান, পাউডার, বিলাতী দুধ, বেবী ফুড, কাপড় ইত্যাদির পারমিট ইস্যু করেন তিনি। সম্প্রতি ন্যায্যমূল্যে লবণের পারমিটও দিতে শুরু করেছেন আলীম সাহেব।

আর একটু সাহস করে যদি চাউলের পারমিটও দিতেন, তাহলে আমরা চির বাধিত হতাম, আলীম সাব।

প্রফেসর মোমেনের কথার সাথে সাথে সবাই হো হো করে হেসে উঠে।

হাসতে হাসতে আলীম সাব জবাব দিলেন– আরে সে অর্ডার পেলে তো আপনাদেরকেই আগে মার্ডার করতাম।

ঃ মার্ডার! মার্ডার মানে? সবার সমোৎসুক প্রশ্ন।

ঃ তা ও বুঝলেন না? –হাসি মুখেই আলীম সাব বলতে থাকেন, আপনারা সবাই তো দেখছি ফ্যামিলী প্ল্যানিং করে আছেন– তিন চারজনের খানেঅলা পুষ্যি। আমার যে চার দু'গুণে আট মুখের ভাত যোগাতে হয়, সাহেব। ন্যায্যমূল্যে চাউলের অর্ডার হলে আপনাদের পারমিট দেবো ভেবেছেন? আপনাদের নাম লিখে আমিই তো নিয়ে নেবো সব।

ঃ আচ্ছা-আচ্ছা সে হবে খন।–সি, ডি, ও, বলে উঠেন, আমার চাউলের কোটা আপনাকেই দিয়ে গেলাম।–আমাদের দিকে তাকিয়ে–হ্যাঁ, আপনারা সবাই সাক্ষী রইলেন কিন্তু। তারপরই আলীম সাবকে বললেন– এখন, এট্ প্রেজেন্ট, বেবীফুড দিতে পারবেন কি না বলুন।

ঃ বেবীফুড?–আলীম সাব যেন সপ্ত আকাশ থেকে পড়েন, এ্যাদ্দিন পর আপনি চাইছেন বেবীফুড? বেবীফুড তো কবে শেষ হয়ে গেছে!

হঠাৎ ফেটে যাওয়া বেলুনের মতো চুপসে গেলেন সি, ডি, ও আনোয়ার সাহেব। বেচারা আপন মনেই বলতে থাকেন– কি করে যে বাচ্চা পালি? ছ'টাকা সের দুধ–তাও অর্ধেক পানি।

ঃ পানি মেশানো দুধ বলছেন, সি, ডি, ও সাব? মাঝে বলে উঠেন ইলেকশন অফিসার ওয়ান, বরং বলেন, দুধ মেশানো পানি।

ইলেকশন ওয়ানের রসিকতাপূর্ণ কথাটায় সবাই হাসলেও মনে হলো তা'তে যেন প্রাণ নেই। দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে এই নির্দিষ্ট আয়ের–

ফিকসড্ ইনকাম হোল্ডারদের অনেকেই হিমসিম খেতে শুরু করেছেন। জীবনের সরস প্রাচুর্য যেন আর নেই।

ঃ আরে রাখেন সাহেব আপনার বাচ্চা।–এডজুটেন্ট গণি সাব তার রাসভারী শরীর দুলিয়ে গম্ভীর ভাবে বলেন, বাচ্চার মা-বাপরা আগে বাঁচুক। মা বাপ বেঁচে থাকলে ইন্‌শাল্লাহ্ বাচ্চার অভাব হবে না।

আবার একটা হাসির লহর বয়ে গেলো টেবিলের চারিদিকে।

ঃ মা বাপরাই আর বাঁচলো কৈ? আজ বাজারে গেছিলেন?–একেবারে নীরসভাবে বলে উঠেন সি, ও রহমান সাব। মরিচ তো চল্লিশের কোঠায় অনেক দিন, আজ চাউল দেখলাম তিনশ টাকায় কেউ বেচ্‌ছে না।

সবাই ক্ষণিকের জন্য বোবা হয়ে গেলো। কোন রা শব্দ নেই। সবার মুখ থেকেই যেনো অনুচ্চ একটা 'ইস্ ইস্' বিষাদ ধ্বনি ইথারে ভেসে গেলো।

আবহাওয়াটাকে সহজ ও স্বাভাবিক করার জন্যেই আমি বলি– তবু তো আমরা বেঁচে আছি।

ঃ কি বলেন আলী সাব, বেঁচে আছি?–ফোঁস করে উঠেন ইলেকশন ওয়ান, বরং মুসলিমের মত বলেন যে, আমরা মরি নাই।

ঃ মুসলিম? মুসলিম আবার কে? টেবিলের চারিদিক থেকে জিজ্ঞাসু চোখগুলি বিস্ফারিত হয়ে উঠে। আমি গলা বাড়িয়ে বলেই ফেলি–না মরা পর্যন্ত তো মানুষ বেঁচেই থাকে। আমি বেঁচে আছি যে কথা, আর আমি মরিনি, এ-ও তো একই কথা। এতে আবার আপনি পার্থক্য দেখলেন কোথা?

ঃ পার্থক্য আছে সাহেব, যথেষ্ট পার্থক্য।–ইলেকশন ওয়ান বলেন, মুসলিমের ঘটনাটা শুনলেই সব বুঝতে পারবেন।

ঃ সে আবার কি ঘটনা?

ঃ শুনুন তা' হলে।

আমরা টেবিলের চারিদিকের চেয়ার নেড়ে চেড়ে গলা খাঁকারী দিয়ে রুদ্ধ শ্বাসে সে কাহিনী শুনতে থাকি।

আমি এটা শুনেছিলাম আমাদের মতলব সরকারের মুখে। মতলব সরকার আমাদের বাল্যবন্ধু। ইস্কুল পর্যন্ত পড়ে আর পড়াশোনা করেনি। আমাদের বাজারে তেল ও বাদামের ব্যবসায় করে, আর লীগ নেতাদের পেছনে পেছনে ঘুরে। সংগ্রামের আগে বুঝি ছিল ইউনিয়ন লীগের সভাপতি– এখন বাংলাদেশ হওয়ার পর হয়েছে মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী। বাজারে আজকাল তার জবর দাপট। ছোট বড় সব মার্চেন্টরাই আজকাল সার্টিফিকেটের জন্য মতলব সরকারের পেছনে ঘুরে।

মতলব সরকার যেভাবে বলেছিলো, আমি ঠিক সেভাবেই তা' আপনাদের শোনাচ্ছি।

১৬ই ডিসেম্বরের পরের ঘটনা। হানাদার পাক বাহিনী মিত্র ও মুক্তি বাহিনীর কাছে

আত্মসমর্পণ করলেও আমাদের ভৈরবের সৈন্যরা কিন্তু তখনো আত্মসমর্পণ করেনি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া সেক্টরের সমস্ত পাকিস্তানী সৈন্যই তখন ভৈরবে এসে জমেছে। এদিকে মিত্র ও মুক্তি বাহিনীর সৈন্যরা চারিদিক দিয়ে ভৈরব বাজারকে ঘিরে রেখেছে।

আমরা তখন ভৈরবের অদূরবর্তী আগা নগর গ্রামে ক্যাম্প করে আছি। আমরা মানে সংগ্রাম কমিটির সকল সদস্যরা। জানতো আমরা কিন্তু কেউ ইণ্ডিয়া যাইনি। তবে আমরাই ছেলেদের ধরে ধরে মুক্তি বাহিনীতে পাঠাতাম– আমার স্লিপ ছাড়া আমাদের অঞ্চলের কেউ আগরতলা ট্রেনিং নিতে পারতো না। আবার ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিরা অপারেশনে এলে আমাদের ক্যাম্পেই আগে আসতো, পরামর্শ ও নির্দেশ নিতো।

আমরা সে সময় ধনী দেখে 'দালাল' ধরছি, আর বড় বড় অংকের মোটা টাকা আদায় করছি। আর যে সব রাজাকার ধরতে পারছি তাদের সাথে সাথে গুলী করে একেবারে খতম করে দিচ্ছি। শালার রাজাকাররা, পাঞ্জাবী কি শত্রু তোরাই হলি দেশের আসল শত্রু। তোদের এমনিভাবে গুলী করে মেরেই বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করবো।

একদিন রামনগর, কালিপুর ও কালিকাপ্রসাদ থেকে সাতজন রাজাকার ধরে আনলো। ক্যাম্পে সেদিন দারুণ উল্লাস। ওদের মাঝে একটা রাজাকারকে আমি চিনতাম। কালিপুরের মুসলিম, সে আগে বাজারে রিকশা চালাতো।

রাজাকারদের দিয়েই বড় রকম একটা কবর খোঁড়ালাম। পাঞ্জাবী শালারা বাঙালীদের মারার আগে যেমন করতো।

কোমর সমান কবরের মধ্যে রাজাকারদের গাদাগাদি করে দাঁড় করিয়ে আমি অর্ডার দিলাম– বাংলাদেশের কলংক রাজাকার শালারারে এক সাথে গুলী করে মাটি চাপা দে–

আমার অর্ডারের সাথে এল, এম, জি গর্জে উঠলো। আর সাথে সাথে সাতটা রাজাকারই তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো।

ঃ মাটি দে– মাটি দে। তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দে–

সাত আটজন সংগ্রামী মুক্তি হাত পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি কবরে মাটি দিতে লাগলো।

এমন সময় কবরের ভিতর থেকে মুসলিম চীৎকার করে উঠলো।–

ঃ মতলব ভাই, আমি মরি নাই, আমাকে গুলী কর। আমি মরি নাই–

আমি হাসতে হাসতে অর্ডার দিলাম ঃ গুলী খরচের দরকার নেই– ওকে জ্যান্তই কবর দিয়ে দে–

সম্পূর্ণরূপে মাটি চাপায় তলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মুসলিম ক্রমাগত বলতেই থাকে ঃ আমি মরি নাই, আমি মরি নাই–

ঃ ঠিক বলেছেন, ইসলাম সাব, আপনি ঠিক আমাদের মনের কথাই বলেছেন। ইলেকশন ওয়ান গল্পটি শেষও করতে পারলেন না, অধ্যাপক মোমেন উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠেন।

ঃ আরে, আমার কথা কি বলছেন– ওটা তো মুসলিমের কথা।

ঃ আরে হয়েছে, হয়েছে। আমরা সবাই এখন একেকজন মুসলিম। রাজাকার না হয়েও

জ্যান্ত মরতে বসেছি।

ঃ হ্যাঁ, ইসলাম সাব, আপনার ঐ বন্ধুটির নাম কি না বল্লেন?

ঃ মতলব সরকার।

ঃ ওহ্ মিষ্টার সরকার? – সি, ডি, ও, রহমান সাব চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। আমরা সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, ঠিক আছে। আমরা সবাই যখন মুসলিম, তখন চলুন, আমরা সকলে মিলে এক হয়ে চীৎকার করে উঠি– সরকার, আমরা মরি নাই, মরি নাই।

রহমান সাবের এ কথার পর অতোগুলো লোকের পরিপূর্ণ হাস্য কোলাহল ভরা রুমটাতে সত্যি সত্যি হঠাৎ কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

এই কথাভরা নীরব, নিস্তব্ধতার মাঝে আমার মনে হলো, ইলেকশন অফিসারের রুমের কবরে আবদ্ধ জীবন্মৃত মানুষগুলোর হৃদয় থেকে উত্থিত মৃদু, আর্ত একটি আকূতি 'আমি মরি নাই– মরি নাই', ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে বাতাসকে যেন ক্রমেই ভারী করে তুলছে।

'বিচিত্রা' ঃ ৫ই অক্টোবর, ১৯৭৪

ভাল মানুষ অমানুষ

ঃ এ্যাঃ কি বললে, আজম সাব খুন করেছে! অসম্ভব। এ হতেই পারে না।

ঃ কি যে বলেন সাহেব– বিশ বছর এক সাথে একই কলেজে প্রফেসারী করছি, তাঁকে খুব ভাল করেই চিনি। আজম সাব দ্বারা এ কাজ হতে পারে না।

ঃ মাটির মানুষ যদি আল্লাহ্ সত্যি তৈরী করে থাকেন তো এই প্রফেসর আজম সাব। থাকি তো বলতে গেলে তাঁর ঘরের দুয়ারেই। কিন্তু একদিনও তার মুখে রাগ বলে কোন জিনিষ দেখলাম না। না, না– আজম সাব এমন কাজ করতে পারে না। এ অসম্ভব।

ঃ খদ্দের তো কতই দেখলাম কিন্তু আজম সাবের মতোন এমন মানুষ আর দেখি না। প্রত্যেক মাসে বেতনটা নিয়েই চলে আসে আমার দোকানে– জাফর মিয়া, হিসাবের খাতাটা লন তো দেখি। কমু কি সাহেব, বাকীর জন্য কোনদিন তাগিদ দিতে হয়নি এই প্রফেসর সাবকে। আহা, অমন মানুষ আর হয় না।

ঃ কতো প্যাসেঞ্জারই তো দেখলাম– রিকশা চালাই শহরে আজ পনের বছর। কিন্তু আমাদের এই স্যারের মতোন মানুষ আর দেখি না। তাড়া লইয়াতো কোন রা-শব্দ নাই-ই, এমন কি অনেক সময় বার আনার জায়গায় একটা টাকাও হাসি মুখে দিয়া গেছে। অমন সোনার মানুষ খুন করছে– আমার বিশ্বাস হইতাছে না।

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন কথা।

থানার ওসি সাহেব বল্লেন, 'স্যার, আসল ব্যাপারটা কি খুলে বলুন তো শুনি? আপনাকে তো চিনি ক'বছর ধরেই– শহরের সব্বার মুখে আপনার প্রশংসা। আপনি তো অমন হীন কাজ করতে পারেন না।

ঃ প্রশংসার সাথে এর কি সম্পর্ক দেখছেন ওসি সাব? প্রফেসর আজম মুখ খোলেন ঃ আপনারা যা শুনেছেন তাই ঠিক। সত্যি আমি খুনী।

ঃ আপনি বল্লেই হলো, খুনী। ও সি সাহেব সোজা হয়ে বসেন।– আপনি কেন যাবেন পথের ভিখারিণী একটা অসহায় অনাথকে খুন করতে? ভিখারীরা তো এমনিতেই না খেয়ে উপোষে রাস্তায় মরে পড়ে থাকে।

ঃ সে হয়তো এককালে ছিল। কিন্তু এখন, বর্তমান বাংলাদেশে অমনটা আর চিন্তা করা যায় না ওসি সাব।– প্রফেসর আজম বক্তৃতাই শুরু করে দিলেন।– পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমি নিজেই, বিশ্বাস করুন, ভিখারিণীকে খুন করেছি। আমি একজন খুনী। আমাকে এরেষ্ট করুন।

ঃ না না, আপনাকে এ্যারেষ্ট করতে আসিনি। আর আপনার মতোন লোককে এ্যারেষ্ট করার ভাবনা কি– আপনি তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না? আপনাকে যে কোন মুহূর্তেই আমার কাষ্টোডিতে নিতে পারি। সে কোন কথা নয়– কথা হচ্ছে–। ওসি সাহেব গলার স্বর নীচু করে মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে অনেকটা ফিসফিসানির মতোই বল্লেন– এস, ডি, ও সাহেব আমাকে ফোনে বলে দিলেন আপনার সাথে কন্টাক্ট করে কেসটা যেন টেক-আপ করি।

ভিখারিণীর মৃত্যুর সঙ্গে তিনি আপনাকে জড়াতে চান না।

ঃ না না, অসম্ভব। আমি, আমিই ওকে খুন করেছি- আমি খুনী।

ঃ আহা উত্তেজিত হবেন না, স্যার। একটু স্থির হয়ে খুনীর পরিণামটা ভাবুন স্যার।

ঃ ভেবেছি, অনেক ভেবেছি। আমার শাস্তিই প্রাপ্য। খুনের বদলে খুন। আমাকে ফাঁসি দেন আপনারা। আমি সব শাস্তি মাথা পেতে নেবো।

খানিক চুপ করে থেকে ওসি সাহেব বল্লেন, ঠিক আছে, আপনাকে আমরা এক রাতের সময় দিলাম। রাতে চিন্তা ভাবনা করে দেখুন। কাল সকালে আপনার বাসায় আসবো। কী বলেন?

ঃ সে আপনাদের খুশী। রাতে, সকালে যে কোন সময় আমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারেন- আমি সব সময়ই যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি।

ও সি সাহেব চলে গেলেন।

সেহরী খাওয়ার পর খানিক গড়িয়ে নেয়ার জন্যেই আজম সাব বিছানায় একটু কাত হয়েছেন। ফজরের আজান হতে বেশ দেরী। কাত হয়ে ভাবছিলেন, বাসার কথা। তিন চারটা বাচ্চার অসুখ। ছোট ছেলেটার তো আজ ঠিক একুশ দিন। জ্বর একদম ছাড়ছে না। আবার পেটটাও খারাপ। অন্য তিনটার জ্বর- প্রায় একই রকম চলছে, সকালে নিরানব্বই, দুপুরে একশ এক, রাতে দুই। কারো কারো বা তিনও উঠছে। আশ্চর্য, কোন ঔষুধেই ধরছে না। হোমিওপ্যাথ- এলোপ্যাথ, এটা ছেড়ে ওটা ক্লোরোমাইসিটিন- সোপোমাইসিন ছেড়ে জেলসিয়াম- এরাম.টাইফলিয়াম- কতো কি কি হচ্ছে। কিন্তু কৈ, কোন পরিবর্তনই যে হচ্ছে না? আল্লাহ অতো রাগ করলেন কেন? বাসার উপর অমন গজব নাজেল হলো কোন পাপে? কি অমন পাপ করেছেন যার জন্যে একটি মাস ধরে আজম সাব অতো ভুগছেন!

ঃ কি আব্বা, শুয়ে পড়লেন নাকি? নামাজ পড়বেন না?

রাণীর ডাকে একটু শরমিন্দা হতে হয়।

ঃ না, না, শুইনি, মা। নামাজটা পড়েই ঘুমাবো।

রাণী পাশের কামরায় চলে যায়।

রাণীটা হয়েছে আলাদা রকমের। অন্য পাঁচটি সন্তানের সাথে কোন মিল নেই। ও পেয়েছে সম্পূর্ণ ওর আম্মার স্বভাব। আম্মার গুণ। পড়াশোনার চাইতে ধর্মকর্ম আর সাংসারিক কাজ কর্মে আগ্রহ বেশী। নামাজে বুঝি ওর আম্মাকেও টেক্কা দেয়। কলেজে পড়ুয়া এ কালের মেয়ে যে অমন নামাজী হবে, ভাবাই যায় না। কোন ওয়াক্তের নামাজই রাণী কাজা হতে দেয় না। ওর আম্মা সেদিন হাসতে হাসতে বলেছিল- তোমার কলেজে পড়ুয়া মেয়ের কাণ্ড শোন- ও আজকাল আবার 'তাহাজ্জত' পড়তে শুরু করেছে।

আজম সাব খুশী হতে পারেনি। এই অল্প বয়সে অতো ধর্মকর্ম বাড়াবাড়ি হচ্ছে নাকি! তাবু স্ত্রী সাজেদা বেগমকে খুশী করার জন্যে বলেছিল, এ আর আশ্চর্যের কি- দেখতে হবে তো কেমন মা'র মেয়ে!

ঃ ঘুমিয়ে গেলে নাকি? ওই শোন মসজিদে আজান হচ্ছে?

– সাজেদা বেগমের তাড়া।

ফজরের নামাজ 'আওয়াল' ওয়াক্তে পড়েই আজম সাব বিছানায় গিয়েছিলো।

কিন্তু বিছানায় শুলেই কি ঘুমাবার যো আছে? মিনিট পনেরো বুঝি ঘুমিয়েছে, রানু এসে ডাকতে শুরু করে, আব্বা-আব্বা, আম্মা আপনাকে ডাকছেন!'

ধরমর করে উঠতেই হয়। এমন ডাক তো আজই নতুন নয়। বাসাতে অসুখ নামক নির্মম 'হাওয়ান'টা ঢোকার পর কতো রাত কতদিন যে এমনিভাবে আজম সাবকে উঠতে হয়েছে।

ঃ দেখ তো অভী অমন করছে কেন? পায়খানা করলো একেবারে পানির মতোন– তারপর বিছানায় এসে এসব কি করছে?– সাজেদা বেগমের চোখে মুখে উদ্বেগ। উৎকণ্ঠা।

আজম সাব তিন বছরের শিশু অভীর বিছানায় এগিয়ে যায়।

ঃ আব্বা, আমি যামুগা– আমি যামুগা–

সাজেদা বেগমের চোখে পানি– কাঁদতে শুরু করেছে। আজম সাব নিজকে সংবরণ করে নেয়। অমন বাচ্চার মুখে এই ধরনের অলক্ষুণে কথা পিতামাতার সহ্য করবার নয়।

ঃ কোথা যাবে, আব্বা, – তুমি কোনখানে যাবে?– মৃতপ্রায় শিশুর উপর ঝুঁকে পড়ে আজম সাব জিজ্ঞেস করে।

ঃ আমি কলেজে যামু, – আব্বার সাথে কলেজে যামু। অভীর একই রকম কান্না।

আজম সাবের মনে পড়লো, রিকশা করে মাঝে মাঝে অভীকে নিয়ে গেছে কলেজে। রুগ্ন শিশু প্রলাপে তাই বলছে।

অবুঝ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয় ঃ তুমি অমনভাবে ভেঙে পড়লে চলবে নাকি? মাথায় পানি ঢাললে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঃ তোমাকে কতবার বলেছি, একটা বকরী সদকা দাও– সাজেদা বেগম কান্না-ভেজা গলায় বলে, তোমার সেদিকে কোন চেষ্টাই নেই।

আজম সাব নীরবে স্ত্রীর ভর্ৎসনা সহ্য করতে থাকে।

ঃ তোমার কাছে টাকা না থাকে, আমি তো বলেছি, বকরীর টাকা আমি দেবো।

ঃ সময় কোথা বলো?– একটু উষ্মার সাথেই জবাব দিতে হয়– আচ্ছা ঠিক আছে, আজই আমি সদকার বন্দোবস্ত করছি।

সাজেদা বেগম অভীর মাথায় পানি ঢালার জন্য বালতি বদনা গামছা গোছাতে থাকে। পাশের বিছানায় রানু রীণার মাথায় পানি ঢালছে। রীণার জ্বর আজ বার দিন।

আজম সাব অজু করার জন্যে গোসলখানায় যায়। রোজার পবিত্র দিনগুলি এমনি এমনি কেটে যাচ্ছে। একদিনও কোরান শরীফ নিয়ে বসতে পারলো না। আল্লাহ্ বালা মুসিবত দিয়ে নাকি বান্দার ঈমান পরীক্ষা করেন।

সকাল ন'টার দিকে স্ত্রী সাজেদা বেগম অপরাধীর মতোন শুধায়– বাজার করার টাকা আছে?

আজম সাব বোবার মতোন স্ত্রীর মুখে তাকিয়ে থাকে। আশ্চর্য, সাজেদা বেগম কি জানে

না গত দু'মাস ধরে কলেজ থেকে বেতন পাওয়া যাচ্ছে না। কলেজের ছাত্র সংখ্যা আশাতিরিক্তভাবে কমে যাওয়ায় অধ্যাপকদের নিয়মিত বেতন পাওয়াই আশংকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু এমন প্রশ্ন কেন?

ঃ টাকা আছে কি নেই, তা জেনে তোমার কি? বাজারের জন্য কত টাকা দরকার তা-ই বলো।

সাজেদা বেগম পাল্টা কি একটা জবাব বুঝি দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নীরবে হজম করে বলে, এখন দশ টাকা হলেই মাছ তরকারীর বাজারটা হয়ে যায়।

ড্রয়ার খুলে আজম সাব স্ত্রীর হাতে একখানা দশ টাকার নোট দেয়। কোন কথা নয়।

ঃ রানু –রানু, আজ রোজার ক'দিন মা?

রানু রীণার পাশ থেকেই জবাব দেয়–আজ রোজার চৌদ্দ দিন, আব্বা।'

চৌদ্দ? মাত্র চৌদ্দদিন। আজম সাব মনে মনে হিসাব করতে থাকে। চৌদ্দদিনে ন'শ টাকা শেষ হয়ে গেলো? বাকী মাস চলবে কি করে? কলেজ থেকে ধার করা হয়েছে যথেষ্ট–তারপর কা'র কাছে হাত পাতবে?

অথচ আজই সদকার বকরী কিনতে হবে। বাসা থেকে অসুখ বিসুখ কমছে না। ছোট ছেলে অভীর অবস্থা ভাল যাচ্ছে না–সদকার ব্যবস্থা করতেই হবে। টাকা? অতোদিন শহরে আছে, টাকার ব্যবস্থা কি করা যাবে না?

আছরের নামাজ শেষ করেই আজম সাব বকরী বাজারের উদ্দেশ্যে বার হয়। ফিরলো একেবারে এফতারের ক্বরিব ওয়াক্তে। তাও আবার খালি হাতে। সাজেদা বেগম অভীর শিয়রে বসে মাথায় পানি ঢালছিল–

ঃ কি, বকরী পাওয়া গেল না?

ঃ না, পেয়েছি।

ঃ তাহলে কোথায়? দেখছি না যে?

ঃ বাজার থেকে কিনে দশজন মিসকিন ডেকে ওদের মাঝে বিলিবন্টন করে এসেছি।

ঃ সদকা দিয়ে এসেছ, সেতো ভালই করেছো–তা'হলে মুখ অমন গোমড়া করে আছ কেন? কী ব্যাপার–কোন দুঃসংবাদ?

ঃ একমাস ধরে বাসায় অসুখ, নিয়মিত মাইনে পাচ্ছি না, ধারের অংক দিন দিনই বাড়ছে, এর চাইতে আরো দুঃসংবাদ আছে না কি?

ঃ এটা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের শামিল–এ তো তোমার গা সওয়া হয়ে গেছে জানি। আজ কি ব্যাপার হয়েছে বল।

বেতের মোড়াটা টেনে নিয়ে আজম সাব বসতে বসতে বলে–আমরা শালার ভাল মানুষ হয়েছি বলে কি সবাই ঠকাবে? ওদের চালাকী, চুরিচামারি কি মোটেই ধরতে পারি না?

ঃ আহা, ব্যাপারটা হয়েছে কি খুলেই বল না?

ঃ বকরী কেনার জন্য আমি নিজে বাজারে যেতে পারিনি–আমি ডাক্তারের চেম্বারে বসে

অভী, রানুদের ব্যাপারে আলাপ করছিলাম। বকরী কেনার জন্য আমাদের কলেজের একজন পিওনকে টাকা দিয়ে পাঠাই। সে অবশ্য বকরী কিনে আনে। কিন্তু সে দাম দিয়ে এল নব্বই টাকা। অথচ সবাই বলাবলি করলো, অত্যন্ত দাম দিয়েছে–এর মূল্য ৫০/৬০ টাকার বেশী হতেই পারে না। পিওন ব্যাটা সাফাই গাইলোঃ বাজারে আজ বেশী বকরী ওঠেনি, তাই অতো দাম নিলো।

ঃ আসলে ব্যাপার কি জান, গিন্নি? পিওন ব্যাটাও জানে আমি অধ্যাপক, ভাল মানুষ, সবাইকে বিশ্বাস করি। আমরার এ ভাল মানুষীর সুযোগে ও আমাকে ঠকালো। মানে আমি ঠকলাম–ঠকলাম আমার কলেজেরই পিওনের কাছে!

ঃ আম্মা, সারাদিন রোজা রাখছি– একটা রুটি-সুটি দিবেন গো আম্মা–

ঃ না গো, মাফ কর–সাজেদা বেগম বলে, বাসায় অসুখ-বিসুখ আমরা রুটি-সুটি করি না।

ঃ দেন গো আম্মা একটা রুটি–

ঃ বললাম তো পারা যাবে না, মাফ কর।

ঃ আম্মা, আম্মা গো–দিন না একটুখানি রুটি।

সাজেদা বেগম ফেটে পড়লো–পিওন ব্যাটা নাকি তোমায় ঠকায় ভাল মানুষ বলে, আর এদিকে আমাকে পাগল করে তুলে ওই ফকির ভিখারিণীর দল। সারাটা দিন জ্বালাবে। যতক্ষণ পারি ততক্ষণ তো দিয়েই থাকি–কিন্তু আমার হয়েছে জ্বালা। রোজ রোজ আমার বাসা থেকে কিছু কিছু পায় বলে ভিখারীর দল ধরে নিয়েছে এ বাড়িতে তাদের 'হক' আছে–না থাকলেও দিতে হবে। দেখছো না তোমার সামনেই কি শুরু করেছে।

আজম সাবের মেজাজ তো এমনিতেই বিগড়ে রয়েছে এখন ভিখারিনীর উৎপাতে এক রকম গরম হয়েই ঘর থেকে বেরোয়।

ঃ শুনছো না, কি বলছে? মাফ কর–অন্যত্র দেখ।

ঃ দিন না আব্বা, আপনিই দিন না কিছু পয়সা–

ঃ কি কি বললে? রুটি ছেড়ে এখন পয়সা? কেন–এটা দানছত্র পেয়েছ? আর মানুষ দেখ না–যাও, যাও বলছি।

ঃ দিন না গো আম্মা–

ঃ আরে বেহায়া বেটি, তোমাকে লাঠিতে না পিটলে বুঝি যাবে না।

ঃ দিন না গো আম্মা একটা রুটি–

ঃ তবে রে বেটি তোরে রুটি–এই বলে আজম সাব উঠানে পড়ে থাকা একটি কঞ্চি নিয়ে ভিখারিনীকে ধাওয়া করলো।

কিন্তু ভিখারিনীর কোন নড়চড় নেই। সে তেমনি বেহায়ার মতো বলেই চলে– দিন্নাগো আম্মা, একটা রুটিটুটি নি আছে?

ঃ যা–যা বেটি। বের হ বাসা থেকে। কঞ্চি হাতে শাসাতে থাকে আজম সাব।

তবু নড়ছে না দেখে আজম সাব কঞ্চি দিয়ে ধাক্কাতে ধাক্কাতে গেইটের দিকে নিতে

থাকে।

ঃ ব্যাটা যেমুন আমারে বাঁশ দিয়া মাইরাই ফালাইবো–এ কথা বলেই ভিখারিনী চীৎকার জুড়ে দেয়, ও মাগো, মাইরা ফালাইলো গো–

ঃ ও, আমাদের ভাল মানুষ পেয়েছিস, না? বাড়ি না দিতেই যখন বলছিস, তখন ল'বেটি বাড়ি–আমরা কেমন ভাল মানুষ বুঝ–এ কথা বলেই জোর এক বাড়ি বসলো ভিখারিনীর মাথায়।

উপোস জীর্ণ শীর্ণ, হাড়জিরজিরে ভিখারিনী 'ও মাগো–' বলে চীৎকার দিয়ে সামনের দিকে দৌড় দিতে চাইলো কিন্তু যেতে পারলো না। গেইটের অদূরে শক্ত ইট বসানো পথের উপর সে উপুড় হয়ে পড়ে গেলো।

'বিচিত্রা' ঃ ৫ অক্টোবর ১৯৭৪

আমল নামা

ঃ আরে, ও সব বুজরুকি বুঝবে না। এটাও ওদের এক রকম পলিটিক্যাল ষ্ট্যান্ট।

ঃ না, আমার কিন্তু অন্য রকম মনে হয়।

ঃ অন্য রকম মানে?

ঃ আমার মনে হয়, অতোদিন যে আকাম-কুকাম করেছে, এখন হঠাৎ অনুতাপের তাপে–

ঃ আরে রাখ তোর নীতিবাক্য। ওরা হলো আসল ঘাঘু পলিটিশিয়ান। ওদের চরিত্র বোঝা অত সহজ নয়। তা'ছাড়া জানিস তো, স্বভাব যায় না ম'লে, কয়লা যায় না ধু'লে।

ঃ তা হয়তো সাধারণতঃ হয় না। কিন্তু আল্লাহ যদি হেদায়েত করেন তো–

ঃ আল্লাহ হেদায়েত করার আর কোন মানুষ পেলো না– পছন্দ করলো তোমার আলী আশরাফকে।

ঃ আরে এখানেই তো আল্লার কুদরত। মানুষ যা ভাবে না, ভাবতে পারে না, সেখানেই তো আল্লার রহমতে যত সব অসম্ভব সম্ভব হয়। এভাবেই তো দস্যু রত্নাকর হন মহর্ষি বাল্মীকি, লুণ্ঠনকারী ডাকাত সর্দার পরিচিত হন কামেল দরবেশ ফুজায়েল রূপে।

ঃ আরে রাখ তোর কুদরত-এ খোদা। কোথায় ফুজায়েল আর কোথায় আলী আশরাফ। হুঁঃ আলী আশরাফও মুসুল্লি আর তেলেচোরাও একটা পাখী।

নানা মুখে নানা কথা।

কেউ বলে, আরে 'বেলেক' কইরা যে অত টাকাপয়সা দালান কোঠা বানাইছে, এইবার হের হিসাব দিতে অইব। শুনতাছি সরকার সব নেতাদের সম্পত্তির হিসাব চাইছে।

ঃ ও, এই ফাঁড়া থাইক্যা বাঁচবার লাইগ্যাই তিনি গোল টুপী মাথায় দিয়া মসজিদে মসজিদে কাটান–

ঃ আরে না, খালি গোল টুপীই না, দেখছস না এই ক'মাসে কতবড় দাড়ি বানাইছে?

আরেক বিজ্ঞ লোক বলে, আরে মিয়ারা, তোমরা যত কথাই কও, আগুন খাইয়া থাকলে আঙ্গরা হইয়া তা' বাইর অইবোই অইবো। কোন ফন্দি ফিকিরেই তা' আটকাইবো না।

এসব কথা শোনার পর থেকেই আলী আশরাফকে একবার দেখার কৌতূহল আমায় কুতকুতি দিতে থাকে। আলী আশরাফ আমার পুরনো বন্ধু বটে, কিন্তু সুহৃদ নয়। একই শহরে জন্ম গ্রহণ করলেও কার্যতঃ আমরা দু'জগতের মানুষ। আমি চাকুরী ব্যাপদেশে থাকি বিদেশ, মানে আমার শহর থেকে দূরে। আলী আশরাফ রাজনীতি করবে বলেই এম, এ পাস না দিয়ে এল-এল, বি হয়ে নিজ শহরে ওকালতি করে। গেলোবার এম, এন, এ-ও হয়েছিল।

আমি যখন স্কুলের ছাত্র, আলী আশরাফ তখন আলিয়া মাদ্রাসার উপরের ক্লাসের তালেবুল এলেম। কলেজে গিয়ে অবশ্য আমরা পরস্পরের কাছাকাছি আসি। আলী আশরাফ তখন এম এম পাস করে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়ে ঢাকা কলেজে ইংরেজী পড়তে এসেছেন। থাকতাম একই হোষ্টেলে। তখন থেকেই রাজনীতির ময়দানে ঘোরাফেরা করতেন। বেশ মনে আছে, '৪৬

সালে সিলেট রেফারেণ্ডামে আমাদের হোষ্টেল থেকে যে ছাত্র দলটি ক্যানভাস করতে যায়, তার লীডার ছিলেন এই আলী আশরাফ। ক'বছর আগে বিজয়ী বীরের মুকুট পরে বাংলাদেশে ফিরে আসার পর ইচ্ছা করেই আলী আশরাফের সাথে দেখা করিনি। পয়লা কারণ, আমি আর আর বাঙ্গালী বীরদের মতোন স্বদেশ ছেড়ে বিদেশ যাইনি। কাজেই আলী আশরাফদের বাঁকা চোখে আমি ঘোরতর অপরাধী– কলাবরেটার। দোসরা, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ তখন আলী আশরাফদের সম্পূর্ণ করতলগত– তখন তার সাথে দেখা করার অর্থ হতো, অহেতুক তোষামোদ করে প্রমোশনের জন্য আলী আশরাফের একটি অব্যর্থ ফোন।

এই দ্বিবিধ কারণে অতোদিন তার বাড়ীর আশেপাশেও যাইনি। তবে দূর থেকে তার সব খবরই রাখতাম।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই আলী আশরাফের ওকালতি ব্যবসা খুব তেজিভাবে চলে ঃ 'দালাল কেইসে' কোন কোন দিন দশ হাজার বিশ হাজার টাকা করে ইনকাম করেছেন। এবং তখনই পুরনো টিনের ঘরটা ভেঙ্গে দিয়ে আধুনিক ফ্যাশানের তিনতলা বিল্ডিং করেন। আর তিনচার বছরে করেছেন, 'আমিন ফ্লাওয়ার মিল' ও 'জাহেদা করাত কল'টা। 'আকাশী বিলে' যে কতো বিঘা বোরো জমি কিনেছেন, কেউ তার সঠিক হিসাব দিতে পারে না। এমন ঘোর সংসারী তড়িৎকর্মা পুরুষটির হঠাৎ পরিবর্তনে আমারও কম খটকা লাগেনি।

ক'দিনের ছুটিতে বাড়ী আছি। এই সুযোগে গেলাম একদিন 'সবুজিমা'– আলী আশরাফের নতুন বাড়ীতে।

গিয়ে শুনি, আলী আশরাফ বাড়ী নেই। 'তবলীগে' গেছেন চাটগাঁ। এক 'চিল্লা' শেষ করে ফিরবেন কুড়ি পঁচিশ দিন পর।

তাজ্জব লাগলো। মানুষের মনের 'চেঞ্জ' হয় শুনি, কিন্তু আলী আশরাফের মতোন একেবারে 'ডাইওমেটিক্যালী অপজিট' অমন আমূল পরিবর্তনের কথা তো শুনিনি! যে লোক নামাজ পড়তো না, রোজা রাখতো না বরং বলতো ওসব ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ নিয়ে তর্ক করতে এসোনা– সেই লোক নামাজ পড়তে পড়তে একেবারে তবলীগে দ্বীনের দাওয়াতে বাড়ীঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আশ্চর্য!

ঈদের সময় দেখা হলো।

চেহারা নমুনা দেখে অবাক হলাম। পিরহান পাজামা, এবড়ো থেবড়ো কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি, সাদা ভারী গোলটুপীর চারিদিকে এমব্রয়ডারী করা 'আল্লাহ মুহম্মদ' আরবী লেখা। ডান হাত পিরহানের পকেটে পুরে (খুব সম্ভব হাতের মুঠোয় ছোট তসবিহ ছড়া) সোফার উপর দু'পা তুলে আসন পেতে বসলেন।

ঃ তারপর কি মনে করে, ডেপুটি সাহেব? তিন চার বছরের মধ্যে কোনদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। আজ কী মনে করে?

আমি একটা চান্স নিলাম।

ঃ এতোদিন তো আপনি আমাদের আলী আশরাফ ছিলেন না।

ঃ আমি আলী আশরাফ ছিলাম না? খুশীর মুখটা হঠাৎ বিস্ময়ে বিবর্ণ হয়ে উঠে।

ঃ আপনি ছিলেন এম, এন, এ–রহীম নগরের মুকুটহীন সম্রাট– বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য সদস্য। – আমি বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলতে থাকি, আমরা নগন্য লোক, আপনার দরবারে আসতে সাহস করিনি।

আলী আশরাফের গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর, আরো কালো হয়ে উঠলো। আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে ডান হাতের তসবিহ ছড়ায় মনোযোগ দিলেন। কার্পেটের দিকে স্থির নেত্রে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করলেন।

আমি অপলক তার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ক'টি মৌনমুহূর্ত। হঠাৎ দেখি আলী আশরাফের ঠোঁট দু'টি নড়ছে, সংকোচন প্রসারণ করে কি যে বলতে চাইছেন– কোন শব্দই বেরিয়ে আসছে না।

এমন সময় দেখি আলী আশরাফের নিমিলিত নয়ন থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু বেরিয়ে আসছে আর এই উদগত অশ্রু সম্বরণ করতে করতে ধরা গলায় বলছেন– তোমরা শুধু আমার অতীতটাই দেখলে– বর্তমানটা দেখবে না?

আমার মুখ খোলার আগেই আলী আশরাফ সশব্দে 'আস্তাগ ফেরুল্লাহ' বলে দীর্ঘশ্বাসের সাথে তার ভেজা চোখ খুললেন।

ঘরের আবহাওয়া এমনভাবে হঠাৎ মোড় নেবে ভাবিনি। তাই পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আমি ধীরে ধীরে বললাম– বর্তমানকে বোঝার জন্যেই তো অতীতের প্রয়োজন। অতীতকে বাদ দিয়ে তো বর্তমানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

ঃ নো-নো। বাধা দিলেন আলী আশরাফ– লেট বাই গনস বি বিগন।

ঃ হ্যাঁ, আপনার এম, এন, এর কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু ফ্লাওয়ার মিল, স'মিল?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, সব ছেড়েছি। সব বাদ দিয়েছি। উত্তেজিত হয়ে বাধা দিলেন আলী আশরাফ।

আমি দারুণভাবে বিস্ময় প্রকাশ করলাম ঃ ছেড়েছেন মানে?

ঃ মিল টিল সবই বিলি বন্টন করে দিয়ে ফেলেছি।

ঃ তা হলে চলেন কি ভাবে? ওই ওকালতিতেই আপনার সংসার চলে?

ঃ না, ওকালতিও ছেড়ে দিয়েছি। একটু থেমে বলেন, ভেবে দেখলাম ওতেও ঠিক হালাল রুজি হয় না।

ঃ বলেন কি, ওকালতিও ছেড়ে দিয়েছেন? তা হলে আপনার অতো বড় সংসার চলছে কি করে?

আসন ভেঙ্গে পা দু'খানা সোফা থেকে নামালেন আলী আশরাফ। ডান হাতখানাও পকেট থেকে বার করলেন। তারপর পা ঝুলাতে ঝুলাতে আলী আশরাফ বললেন– সব কিছুই আল্লাহ চালান, মিয়া।একটু থেমে নিজের থেকেই বলতে থাকেন, ষ্টেশন রোডে একটা হোটেল লক্ষ্য করেছো কিনা জানি না– নাম দিয়েছি 'আপ্যায়ন'– রেসিডেন্সিয়াল হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট– এখন ওই হোটেল বিজনেসই করবো বলে নিয়ত করেছি।

আমি নিশ্চুপ। আলী আশরাফের অভাবনীয় পরিবর্তনের কথাই চিন্তা করছিলাম। এক সময় চিন্তাটাই হঠাৎ মুখ-বিবর দিয়ে বেরিয়ে এলো–আশ্চর্য! আপনার মতি গতির অমন

পরিবর্তন হলো কি করে ভেবে পাইনা।

আলী আশরাফ মৃদু হাসলেন।

আমি ভাবলাম, এবার তিনি লম্বা একটা শ্বাস ফেলে পরম বিজ্ঞের মতো বলে উঠবেন, সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা- তাঁর মর্জি।

কিন্তু না, আলী আশরাফ ঠোঁটের উপর হাসির রেখাটি বিস্তৃত করে বললেন- চেরাগ আলীর কাণ্ড। চেরাগ আলীই আমাকে নতুন পথ দেখালে-

চেরাগ আলী! আমার বিপুল বিস্ময় ঝরে পড়ে, চেরাগ আলী কে? চেরাগ আলী আবার আপনার কি করলো?

ধ্যান গম্ভীর হয়ে ধীরে ধীরে আলী আশরাফ বলেন- চেরাগ আলী- রেশন ডিলার- তোমাদের পাইক পাড়াতেই বাড়ী- ওই চেরাগ আলীই আমার মনে নতুন চেরাগ জ্বালায়।

এতটুকুন বলেই আলী আশরাফ হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে উঠেন- আরে গল্পে গল্পে তো আমার খেয়ালই হয়নি, কতক্ষণ হয়ে গেলো, তোমার চা'র কথাই যে বলা হলো না। ওরে- ও দারু, এ ঘরে দু'কাপ চা দিয়ে যা-

সেদিন শনিবার। রাত আটটার দিকে নাসির এলো- নাসির আমার ফ্লাওয়ার মিলের ম্যানেজার। নাসিরের সাথে চেরাগ আলীও।

ঃ কাল রোববার- তারপর দিন সোমবারেও নাকি ব্যাঙ্ক বন্ধ। নাসির বলে- আজকের ক্যাশ, এই দশ হাজার টাকা আপনার বাসায়ই রেখে দিন।

আমি টাকার ব্যাগটা হাতে করে উঠতে যাচ্ছি, চেরাগ আলী বলে উঠে ঃ স্যার, আমার এই পাঁচ হাজার টাকার বাণ্ডিলটাও আপনার কাছে দয়া করে রেখে দিন।

ঃ আচ্ছা দাও।

চেরাগ আলীর টাকার বাণ্ডিলটা ব্যাগে পুরে আমার দশ হাজার টাকা নিয়ে বাসার ভিতর চলে যাই।

দুদিন পর মঙ্গলবার আমাকে ঢাকা যেতে হয়। হ্যাঁ, ষ্টেশনে রওয়ানা হচ্ছি এমন সময় হঠাৎ মনে পড়লো স'মিলের টাকার কথা। ষ্টেশনের পথেই টাকার ব্যাগটা নিয়ে নিলাম।

ব্যাংকের জমার বইনিইনি। ব্যাংক থেকে একটা ডিপোজিট স্লিপ নিয়ে তাতে 'দশ হাজার টাকা মাত্র' এই লিখে ওই স্লিপ সহ টাকার ব্যাগটা কেশিয়ারের টেবিলে রেখে বললাম- এই নিন এতে দশ হাজার টাকা আছে।

তারপর ঝটপট রিক্শায় চাপলাম।

ব্যাংকের সব কর্মচারী আমার পরিচিত। কোনদিনই আমি গুণে টাকা জমা দেইনি। টাকার ব্যাগ রেখে দিয়ে আসি, আর জমা বইতে টাকার অঙ্কটা লিখে দিই। ওরা গনেটনে হিসাব করে আমার একাউন্টে জমা দিয়ে দেয়। কোনদিন কোন রকম গোলমাল হয়নি। কিন্তু গোরমাল হলো সেদিন।

আমি তো সাত-আটদিন ঢাকায় কাটিয়ে বাড়ী এলাম। বাড়ী আসতেই চেরাগ আলী এসে

হাজির – হুজুর, আমার টাকার দরকার ছিল।

চেরাগ আলীর এ কথার সাথে সাথেই সাঁ করে আমার মাথায় বাড়ি পড়লো, সর্বনাশ, চেরাগ আলীর টাকাটাও তো ওই ব্যাগে ছিল। আর আমি তো সেদিন মাত্র দশ হাজার টাকা জমা দিয়েছি।

ঃ তোমার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে রেখেছি। চলো, ব্যাংক থেকে টাকা দেবো।

হন্তদন্ত হয়ে ব্যাংকে গেলাম। ম্যানেজার সব শুনে দু'ক্যাশিয়ারকেই ডাকলেন। তারা বললো– না স্যার, আমরা ব্যাগে দশ হাজারই পেয়েছি। বেশী পেলে সাথে সাথেই স্যারকে খবর দিতাম।

যুক্তিটা মন্দ নয়।

কিন্তু চেরাগ আলীর টাকা তো আমি এই ব্যাগেই রেখেছি। এটা তো মিথ্যা নয়। তা হলে টাকাটা গেলো কোথায়?

ঃ আপনি যান, স্যার; ম্যানেজার বলে, আমরা অফিসের পরে বিকালে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাটি করে তালাস করে দেখি কোন ক্লু পাওয়া যায় কি না।

আমি পড়লাম মহা দুশ্চিন্তায়। ব্যাপারটা কি? চেরাগ আলীর টাকা গেলো কোথায়?

ইতিমধ্যে সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, অগ্রগামী ব্যাংক এম, এন, এর পাঁচ হাজার টাকা মেরে দিয়েছে। বন্ধুদের পরামর্শমতো আমি নিজে চেরাগ আলীর খাতাপত্র দেখলাম। না, সেদিন তার তহবিলে মোট চার হাজার ন'শ আশি টাকা ছিল। চার হাজার ন'শ আশি আর পাঁচ হাজার একই কথা–বিশ এর জন্য কিছু যায় আসে না। আমিও সবার কাছে বলি, চেরাগ আলী আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকাই আমানত রেখেছিল।

ঃ স্যার, কেশিয়ার কোন মতেই স্বীকার করে না। ম্যানেজার বলে, আপনি একটি কমপ্লেন দেন স্যার। একথা লিখে দিন যে, আপনি পনের হাজার টাকাসহ ব্যাগ ক্যাশিয়ায়ের হাতে দিয়েছিলেন–কেশিয়ার মাত্র দশ হাজার টাকা জমা করেছে। দেখবেন, ওদের দু'জনের চাকুরীই খতম করে দিচ্ছি।

আমি বলি, সে কি করে হয়? আমি নিজ হাতে জমা বইতে দশ হাজার লিখে দিয়েছি। এখন কি করে বলি, ওতে পনেরো ছিল? মহাচিন্তায় পড়া গেল।

চেরাগ আলী টাকা আমানত রেখেছে, ওর টাকা তো আমি দেবোই–দিতে আমার কোন অসুবিধাও হবে না। কিন্তু কথা হলো, পাঁচ হাজার টাকা তো নিজ হাতে দশ হাজারের সাথে রাখলাম এবং সব টাকাসহ ব্যাগ ব্যাংকে দিয়ে এলাম। সব টাকাইতো ব্যাংকে থাকার কথা। আমার হিতাকাঙ্ক্ষী শহরের বহু লোক কেশিয়ার দু'জনকে নানাভাবে বুঝালো, প্রলুব্ধ করলো, শেষে ভয় দেখালো–কিন্তু না, ওদের ওই একই কথা –দশ হাজারের বেশী টাকা ওরা পায়নি। দেনদরবারের পর কিছুদিন গেলো নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে–চোর ধরার দেশীয় প্রথা–মরিচ পরীক্ষা, ক্ষুর পরীক্ষা, এমন কি জ্বীন নামানো পর্যন্ত। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হলো না। এমন সময় খোঁজ পেলাম, তহসিল অফিসের চৌধুরী আয়না পরীক্ষা জানে–তার পরীক্ষাতে টাকা চুরির সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক জানা যাবে। আনা হলো চৌধুরীকে। চৌধুরী বললো, আয়না

লাগবে, আর চাই একজন তুলারাশির লোক।

খোঁজ তুলারাশির লোক। সারা শহরেও একটা তুলারাশির লোক পাওয়া গেলো না।

অবশেষে খোঁজ পাই, স্থানীয় বয়েজ হোমে তুলারাশির একটি ছেলে আছে।

রোববার সন্ধ্যার পর চৌধুরী এলো। এলো তুলারাশির ছেলে। আর এলো আমার হিতাকাঙ্ক্ষীবন্ধু-বান্ধব, উকিল, মোক্তার, অধ্যাপক ও রাজনৈতিক কর্মীরা।

সে এক আশ্চর্য ঘটনা।

লাইটের নীচে টেবিলটা সরিয়ে নিয়ে এক চেয়ারে চৌধুরী বসে পাশের চেয়ারে চৌদ্দ বছরের তুলারাশির ছেলেকে বসাল। তার হাতে একখানা মাঝারী সাইজের আয়না দিয়ে চৌধুরী বলে, দু'হাতে শক্ত করে ধরে আয়নাটার দিকে তাকিয়ে থাক। আয়নাতে যা দেখবে সত্য সত্য তা বলবে, কেমন?

ছেলেটি ঘার কাত করে বললো–আচ্ছা। এবার চৌধুরী ছেলেটির গায়ে একটি হাত রেখে বিড় বিড় করে কি যেন পড়তে শুরু করে। আমরা ঘরভর্তি লোক তো রুদ্ধশ্বাসে সব দেখছি। কয়েক মিনিট পরে দেখি, ছেলেটির হাত কাঁপতে শুরু করেছে, সাথে সাথে হাতের আয়নাটাও। কিন্তু ছেলের চোখ দু'টি আয়নার মধ্যে নিবদ্ধ।

চৌধুরী ছেলের গায়ে হাত রেখেই বিড় বিড় করছে আর ওর মাথায় ঘন ঘন ফুঁ দিতে শুরু করেছে। তারপর এক সময় প্রশ্ন করলো, কি দেখতে পাচ্ছ?

ছেলেটি কম্পমান আয়নার দিকে চোখ রেখে বলে–একটা কাপড়ের পুটলী।

চৌধুরী মন্ত্র পড়াবস্থায়ই আবার বলে– ভাল করে দেখ। এবার?

ঃ একটা পাগড়ী।

ঃ পাগড়িটাকে তোমার কাছে আসতে বল। এবার কী দেখছো?

ঃ পাগড়ি মাথায় একজন মৌলানা সাহেব।

আমরা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলাম। চৌধুরী বললো–এম, এন, এ সাহেবের কিছু টাকা চুরি হয়ে গেছে। এখন টাকাটা কোথায় আছে, উনাকে জিজ্ঞেস কর, উনি উত্তর দিবেন।

আমরা নির্বাক বিস্ময়ে থ হয়ে দেখছি।

ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে বললোঃ সব টাকা ব্যাংকে।

আমরা সবাই কৌতূহলী হয়ে নড়েচড়ে বসলাম, বলে কি?

চৌধুরী ফের বলে ঃ তুমি তাকে বল, এম, এন, এ সাহেবের টাকা কোথা থেকে কিভাবে ব্যাংকে গেল সমস্ত ঘটনা তোমাকে দেখাবার জন্য।

আমরা অধীর আগ্রহে সামনে তাকিয়ে আছি। চৌধুরী ছেলের গায়ে একটা হাত রেখে বসে আছে। এখন মুখে কোন মন্ত্রতন্ত্র নেই। ছেলেটি সদা কম্পমান আয়নার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কি যেন দেখছে।

ঃ স্যার এক হাতে টাকার ব্যাগ, আরেক হাতে এটাচি ব্যাগ নিয়ে বাসা থেকে হেঁটে যাচ্ছেন–

ঃ দেখতো স্যারের পরনে কি?

ছেলেটি বললোঃ প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট।।

ঃ কোথায় যাচ্ছেন?

ঃ এই মাত্র একটা রিক্‌শায় উঠলেন।

ঃ হ্যাঁ দেখো দেখো রিক্‌সা কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে কোথা যায়–সব তোমাকে দেখাবে।

ছেলেটি বলতে শুরু করেঃ রিকসা সামনে রাস্তা দিয়ে কুমারশীল মোড়ে মসজিদের পাশ দিয়ে চলছে–সিনেমা হল পার হয়ে কোর্ট রোডে ঢুকলো–কোর্ট রোডে গিয়ে রিকসা থেকে নামছেন–এই ব্যাংকে ঢুকছেন–

ঃ কোর্ট রোডে তো অনেক ব্যাংক। কোন ব্যাংকে ঢুকলেন। নামটা দেখো ব্যাংকের উপরে সাইন বোর্ড আছে। তুমি বলো, ব্যাংকের নাম দেখাবে।

ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে চোখ বড় করে কিছু পড়ার চেষ্টা করলো। তারপর হঠাৎ বলে উঠলোঃ অগ্রগামী ব্যাংক।

ঃ আচ্ছা এবার দেখতো টাকার ব্যাগ এম, এন, এ সাহেব কোথায় রাখলেন?

ঃ টাকার ব্যাগটা কেশিয়ারের টেবিলে রাখলেন।

ঃ আচ্ছা এবার দেখ তো ব্যাগের মধ্যে মোট কত টাকা আছে?

ছেলের হাতের আয়না কাঁপছে তো কাঁপছেই।

চৌধুরী এক হাতে আয়নাতে ধরে আছে। পাশের আরো একটি হাত আয়নাটাকে ধরে। কাঁপুনি কমছে না।

চৌধুরী আবার বলে ঃ তুমি বল, টাকার অংকটা লিখে দিতে।

আমাদের অবস্থা তখন ছেলের মতোই রীতিমতো ঘর্মাক্ত। উত্তেজনায় আমরাও রুদ্ধশ্বাসে ছেলের মুখে তাকিয়ে ঘামতে শুরু করেছি। ছেলেটি যেন কষ্ট করে আস্তে আস্তে বললো–পড়া যায় না।

ঃ বল স্পষ্ট করে লিখে দিতে।

ছেলেটি এবার বেশ জোরেই বলে উঠলোঃ চৌদ্দ হাজার নয় শত আশি।

আমার মুখে হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেলো। আশ্চর্য এ কেমন করে সম্ভব হলো।

চৌধুরী বলে–আচ্ছা ব্যাংকে কত টাকা জমা করা হয়েছে?

ঃ দশ হাজার টাকা।

ঃ বাকী টাকা কোথায়?

ঃ দু'জন ভাগ করে নিয়ে গেছে।

ঃ আচ্ছা ভাল করে দেখ তো দু'জন লোকের চেহারা কেমন?

ছেলেটি তেমনি কাঁপতে কাঁপতেই বলেঃ একজন লম্বা, ফর্সা–আরেক জন কালো, বেঁটে–

ঃ এখন টাকাগুলি কোথায়, কিভাবে আছে?

ঃ একজন কিছু খরচ করেছে– আরেকজনের টাকা সম্পূর্ণই রয়ে গেছে।

আমি বলে উঠলাম, চৌধুরী, হয়েছে-হয়েছে। আর দরকার নেই– বাদ দাও।

চৌধুরী ছেলের গা থেকে হাত সরালো। আর অমনি ছেলেটি মাথা এলিয়ে দিল টেবিলের উপর।

চৌধুরী বলে উঠে ঃ ঘরের ফ্যানটা চালিয়ে দিন। ওর বিশ্রাম দরকার।

আমরা উপস্থিত সবাই বুঝলাম, চেরাগ আলীর টাকাটা ব্যাংকের ক্যাশিয়ার দু'জন মেরে দিয়েছে।

আমি বললাম, টাকাটা কি শেষে ওদের কাছ থেকে উদ্ধার করলেন?

আলী আশরাফ সহজ সুরে বলেন ঃ না, টাকা আমি পাইনি। ক্যাশিয়ার দু'জন কোন মতেই স্বীকার করলো না।

আমি অবাক হয়ে বলি ঃ অমন পরীক্ষার পরও টাকাটা উদ্ধার করতে পারলেন না– আশ্চর্য! তা হলে চেরাগ আলী আপনার মনে চেরাগ জ্বালালো কেমন করে?

ঃ আরে এখনো বুঝতে পারলে না? শোন তবে। চেরাগ আলীর টাকা খোয়া যাওয়াতেই তো চৌধুরীকে আনি– চৌধুরী আয়না পরীক্ষা দেয়। চৌধুরীকে আমি শেষে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা, ব্যাপারটা কি? ছেলেটি সত্য ঘটনাগুলি হুবহু দেখলো কেমন করে?

চৌধুরী জবাব দিয়েছিলো ঃ এতো আমি বলতে পারবো না স্যার। আমি কোরান শরীফের এক আয়াত সুরাহ জ্বীনের অংশ বিশেষ পড়ে তুলা রাশির লোককে ফুঁ দিই, তার ফলে সেই সব দেখে। আমি কিন্তু কিছুই দেখতে পারি না স্যার। সবই আল্লার কালামের বরকত, স্যার।

ঃ জান ডেপুটি, এঘটনা আমাকে পেয়ে বসলো। রাতদিন, সময়ে অসময়ে আমার মনে কেবলি বাজতে থাকে– চুরির ঘটনা ঘটে গেলো এক মাস আগে– বেশ অতীতের ঘটনা। সেই অতীতের ঘটনাকে চৌধুরী বর্তমানের একেবারে জলজ্যান্ত চলতি ঘটনা হিসাবে, সিনেমার ছবির মতো প্রত্যক্ষবৎ দেখলো কিভাবে? এ কি করে সম্ভব হলো? অতীতের ঘটনা কি শেষ হয়ে যায় না? তা হলে সব ঘটনাই কি শূন্যে এখনো বর্তমান আছে? কোন ঘটনারই কি তা' হলে মৃত্যু নেই? ক্ষয় নেই? এ সংসারের সকলের সকল ঘটনাই কি তা হলে শূন্যে বা ইথারে বর্তমান রয়েছে?

আলী আশরাফ একটু থেমে গলার স্বরটাকে বদলিয়ে আবার বলেন– আমার হঠাৎ খেয়াল হলো, পাক কালামের একটুখানি আয়াতেই যদি এ মর পৃথিবীর মানুষ অতীতকে বর্তমানে এনে প্রত্যক্ষ করাতে পারেন তো কোরান যে বলে, আখেরাতে আমাদের প্রত্যেকের হাতে যার যার 'আমলনামা' দেয়া হবে– সে নিজেই তার জীবনের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে– এতে তো কোন সন্দেহ শুবা দেখি না? তখনই আমার মনে পড়লো– আলইয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম, ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদীহিম, ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কানু ইয়াকছিবুন।

আমি বলে উঠলাম ঃ এর কি মানে কিছুই তো বুঝলাম না।

আলী আশরাফ ধ্যানস্থ দরবেশের মতোন বলতে থাকেন– কোরান পাকের ২৩শ পারায়

সূরা ইয়াছীনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রোজ হাশরের ময়দানে আমাদের হিসাব নিকাশের দিনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন এইদিন আমি তাহাদের মুখ সমূহের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিব এবং তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহাদের হস্তসমূহ তাহা আমাকে বলিয়া দিবে এবং তাহাদের চরণগুলিও সাক্ষ্য দিবে।

একথা বলেই আলী আশরাফ চোখ বন্ধ করে নিশ্চুপ বসে রইলো।

সেদিন ভুতপূর্ব জননেতা আলী আশরাফের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার পর আমার কেবলি মনে হতে লাগলো, আমি যেনো তুলারাশির লোক। আলী আশরাফের মুখ নিঃসৃত আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম আমার কানে ঢোকার পর আমি ভুতপূর্ব জননেতাদের সকল আমলনামাই দেখতে পাচ্ছি।

আহা! সকল নেতাই যদি একেকজন বর্তমান আলী আশরাফ হয়ে যেতো!

'দৈনিক ইত্তেফাক' ঃ ১৯৭৯

'স্বর্গ হইতে বিদায়'

বিমল বাবু, আপনি যথার্থই বলেছেন– মানুষ একই ভাবনার সুতোয় গাঁথা। তা' না হলে কোথাকার কোন গুরুচরণ পালের সাথে আমাদের সুরুজ মিয়ার অমন মিল হলো কি করে?

সুরুজ মিয়ার কাহিনীটা তা'হলে আপনাকে খুলেই বলি।

ইষ্টিশনের বাইরে এসে প্রথম ধাক্কাটা খেলেন– এ অতো রিকশাও হয়ে গেছে এই বন্দরে! রাস্তার দু'পাশে তো দেখা যায় সারিসারি রিকশা আর রিকশার হুড।

ভীড়ের ঠেলাঠেলি, রিকশায় ক্রিং ক্রিং আর রেলষ্টেশনের যাত্রী-কুলির হৈ চৈ এর মধ্যে রিকশাওয়ালাদের তীব্র চীৎকার কানে বাজে–

ঃ এই বাজার–বাজার–

ঃ এই লঞ্চঘাট–লঞ্চ ঘাট–

ঃ এস, টি, অফিস–

ঃ কমলপুর একজন, কমলপুর–

ঃ বাজার একজন–বাজার–

জাবেদ সাব ক্ষণিকের জন্য থামেন। ক'টি মুহূর্ত মাত্র। একটু খানি চিন্তা। কোথা যাবেন? কার কাছে যাবেন আগে? কোন্‌খানে গেলে তাঁর মকসুদ হাসেল হবে?

না, আগে একটা হোটেলে উঠা যাক। রাত্রে তো মোটেই ঘুম হয়নি। আজ-কালবিমানে ঘুমানো যায় নাকি? আর বিমান থেকে নেমেই তো সোজা কমলাপুর ষ্টেশন। গাড়ীতেও যা 'রাশ'–ফার্ষ্ট ক্লাশেও আরাম করে বসার সুযোগ মিললো না।

ঃ এই চলো– বাজার চলো। হাতের এটাচি ব্যাগটা পায়ের নীচে ঠেলে দিয়ে আরাম করে বসলেন জাবেদ ইকবাল।

মাথার উপর ফাল্গুনের কড়া রোদ। তবু হুডটা তুলেন না। এদিক-ওদিক সব দিক দেখতে চান জাবেদ সাব। তাঁর চেনা বন্দরটির অচেনা চেহারা রীতিমতো অবাক করেছে তাঁকে।

রিক্‌শা ভীড় কাটিয়ে চলতে শুরু করে। বাঁ পাশে উঁচু রেল সড়কটি মেঘনা পুল পর্যন্ত চলে গেছে। উঁচু সড়কের ডান ঘেঁষে নীচু পায়ে চলা পথ। রিকশা, বেবী টেক্সী, ঠেলাগাড়ীও চলাচল করে। উঁচু পানির ট্যাংকিটা পার হতেই জাবেদ সাবের মনে পড়লো, দুনিয়ার সব কিছু উলোট-পালট হলেও মুসলমানদের গোরস্থানের তো কোন পরিবর্তন হয় না। গোরস্থানটা নিশ্চয় আগের মতোই আছে।

হ্যাঁ, তাঁর কথাই ঠিক। রিকশা কয়েক প্যাডেল এগুতেই ডানে দেখা গেলো সেই গোরস্থান–পঁচিশ বছর আগে যেমনটা দেখেছিলেন। না একটু পরিবর্তন হয়েছে বৈকি! আগে সামনের দিকটা পাঁচিল ঘেরা ছিল, এমন পূর্বদিকটাও ঘেরাও করা। এই কোণায় ছোট্ট একটা মসজিদও করা হয়েছে বুঝি। জাবেদ ইকবালের মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে এলো– আসসালামু আলায়কুম ইয়া আহ্‌লাল কুবুরে।

রিকশা যতই এগুচ্ছে জাবেদ সাব ততোই অবাক হচ্ছেন। রাস্তার ডান পাশে, গোরস্থানের পূর্ব দিকটা তো জলাভূমি বোরো ক্ষেত ছিল। আর এখন তো সেখানে আধুনিক ডিজাইনের ইয়া বড়ো সুন্দর সিনেমা হল 'পলাশ'। আর ছোট ছোট রেষ্টুরেন্ট।

আরে–আরে, সিনেমা হলের দক্ষিণে বাজারের পশ্চিমে অতো বড়ো বড়ো ঘরবাড়ী কোত্থেকে এলো?

রিক্সাওয়ালা বললো, আরে সাহেব এডাও জানেন না–এইডা হইল জব্বার জুট মিল।

জাবেদ সাবের বুক থেকে দীঘল শ্বাস বেরুলো। বাজারের পশ্চিমের এই খোলা জায়গাটাতে এক সময় গরু দৌড়, নৌকা বাইচও হতো। রেল সড়কের এখানে দাঁড়ালে শুধু মাঠ আর মাঠ–ব্রহ্মপুত্র–মেঘনার মিলন স্থল শ্মশানঘাট পর্যন্ত দৃষ্টি পথে আর কোন বাধাই ছিলো না। আর আজ মাত্র পঁচিশ বছরে কতো অদল বদল হয়ে গেছে।

রিকশা রেলওয়ের পথ ছেড়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে উঠে ডান দিকে চললো।

রেলওয়ে লেভিং ক্রসিংয়ের একটু সামনে ডি, বি রোডের উপর ইয়া বড় গেইটখানা। জাবেদ সাব এ বন্দরে থাকাকালীনই এ গেইটটা তৈরী হয়েছিলো। উপরে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ছিলো– 'কায়েদে আজম গেইট।'

গেইটটার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় কৌতূহলী হয়েই জাবেদ সাব উপরে তাকালেন। গেইটের উপরে নামটা পড়েই আরেকটা ধাক্কা খেলেন। ধাক্কাটা সামলে নিয়ে রিকশার বডিতে দু'হাত শক্ত করে ধরে নামটা আবার পড়লেন–

ঃ বঙ্গবন্ধু তোরণ।

'কায়েদে আজম' থেকে বঙ্গবন্ধু!'

দু'টি নামের ব্যবধান। অথচ কতো বছরের ফারাক। জাবেদ ইকবাল ভৈরব বাজার আসে ১৯৫০ সালে। এক বছর পর চলে যান খুলনা। সেখান থেকে করাচী। করাচী থেকে গুজরাট। গুজরাট থেকে আজ ১৯৭৫ সালে তিনি এসেছেন ভৈরব। পূরো পঁচিশ বছর পর। সুদীর্ঘ সময়ের ঘূর্ণিতে কায়েদে আজম গেইট রূপান্তরিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু তোরণে।

রিকশা চলেছে। বাজার থেকেও রিকশা আসছে। রাস্তার দু'পাশে ষ্টেশনারী, মনোহারী, রেষ্টুরেন্ট, হোটেল এর সারি সারি দোকান। লোকের ভীড়। গেইটটার সাথেই বাঁ পাশে ছোট্ট একখানা মসজিদ। হ্যাঁ মসজিদটাও তেমনি আছে, যেমন দেখেছিলেন পঁচিশ বছর আগে।

রৌদ্রকরোজ্জ্বল এই দুপুরে চলন্ত রিকশার উপর বসে থেকে জাবেদ ইকবালের মনে সহসা এক তত্ত্ব কথার উদয় হলো। তাঁর মনে হলো, কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন, ধন মান। অস্থির জগতে স্থির থাকে শুধু আল্লার ঘর মসজিদ আর গোরস্থান।

মসজিদ পেরিয়ে আর একটু সামনে যেতেই জাবেদ সাবের হঠাৎ মনে পড়লো আরে, মসজিদওয়ালা বাড়ীটা তো চেয়ারম্যান সাবের। ভৈরবের প্রথম চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান সাবের কাছে গেলেই তো অনেক সাহায্য পাওয়া যেতো। তিনি গুজরাট থেকে যে উদ্দেশ্যে এতদূর রাস্তা এসেছেন, তার একটা কূল-কিনারা পেতেন।

ঃ এই রিক্সাওয়ালা, একটু থামাও।

ঃ বাজারে না যাইবেন কইলেন, এইখানে থ্যামাইমু কেরে?

বলতে বলতে রিক্শাওয়ালা চীৎকার দিলো ঃ এই আস্তে আস্তে, আমি থামুম, পিছনের 'রিকশা' বাইরা যাও গা।

রিকশা থামালে জাবেদ সাব বললেন, তুমি চেয়ারম্যান সাবের বাড়ী চেন?

ঃ চেয়ারম্যান? কোন্ চেয়ারম্যান-এর কথা কইতাছেন?

জাবেদ সাব একটু বিপাকে পড়েন। ঠিকই তো, পঁচিশ বছরে তো মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানেরও পরিবর্তন হয়ে গেছে। কতো চেয়ারম্যান না জানি এসেছেন, গেছেন। তাই একটুখানি চুপ থেকে ভেবে নিয়ে বললেন, ওই যে ভৈরবের প্রথম চেয়ারম্যান, যার এক ভাই এস, ডি ও ছিল?

ঃ ও আপ্নে লতিফ মিয়ার বাড়ীর কথা কইতেছেন? হেই বাড়ী ত পিছনে ফালাইয়া আইছি। ওই গেইটের বগলের বাড়ী।

ঃ চলো–রিকশা ফেরাও। চেয়ারম্যানের বাড়ী হয়ে আসি।

রিকশা ঘুরে 'বঙ্গবন্ধু তোরণের' কাছে মসজিদটার পাশে এসে থামলো। আশ্চর্য! এমন চেহারা হয়েছে চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীর? রিকসা থেকেই জাবেদ সাব বাড়ীটা জরীপ করতে থাকেন। বাড়ীর সামনে টপ্ বারান্দাওয়ালা জুড়ি-ঘরের মাঝখানে সুন্দর করে লেখা ছিলো বড় অক্ষরে– 'পাকিস্তান হাউস।' আর আজ? জাবেদ সাব বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন সেই জুড়ি ঘর পোড়া টিনে এবড়ো-খেবড়োভাবে দাঁড়ানো। আর তার মাঝখানে নতুন রংয়ে নতুন ঢংয়ে বাড়ীর নামটি লিখিত 'বিপ্লব ভবন।' বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে জাবেদ সাবই রিকশাঅলাকে বলেনঃ চেয়ারম্যানকে এখন বাড়ীতে পাওয়া যাবে কি?

ঃ চেয়ারম্যান? আপনে ইতা কী কইতাছেন? চেয়ারম্যান সাব মারা গেছেন আইজ দশ-বার বছর হইয়া গেলো!

ঃ চেয়ারম্যান মারা গেছেন? অস্ফুট কণ্ঠে কথা ক'টি বলেই নির্বাক হয়ে স্থির নয়নে তাকিয়ে থাকেন সামনে– 'বিপ্লব ভবন' লেখাটির পানে। চেয়ারম্যান সাব নেই, 'পাকিস্তান হাউস'ও নেই। চোখের সামনে এখন পোড়া বাড়ী, 'বিপ্লব ভবন'।

ঃ চেয়ারম্যান সাবের কোন ছেলেটেলে?

ঃ না সাহেব–উনার কোন ছেলেই বাড়ীত থাকে না। ছেলেরা নানা জায়গায় চাকরী করে।

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলেন জাবেদ ইকবাল।

ঃ হু, ঠিক আছে–চলো বাজারে।

রিকশা চালাতে চালাতে রিকশাঅলা বলেঃ আপনে এই পরথম ভৈরব আইলেন বুঝি?

ঃ না, ঠিক প্রথম নয়–বলতে পার তোমাদের বাংলাদেশ হওয়ার পর এই প্রথম। পঁচিশ বছর আগে আমি বাজারে অনেকদিন কাটিয়েছি।

ঃ ওহ্ হেই কথা কন।–রিকশাঅলা নিজের থেকেই বলতে থাকে, এখন দেখবেন, কত রদবদল। আপনি দেখলে চিনতেই পারবেন না।

ঃ আচ্ছা আগের সেই তাজমহল হোটেলটা আছে তো?

ঃ তাজমহল-হটল আর নাই। শালার পাঞ্জাবীরা বাজারটারে পুড়াইয়া একবারে ছাই বানাইয়া দিছিল। –রিকশাঅলা স্বরটাকে অদ্ভুতভাবে বদলিয়ে নিয়ে বলেঃ এখন দেখবেন নতুন ভৈরব, নয়া নয়া দালানকোঠা। এখন বড় হটেল হইল আপনের 'আপ্যায়ন'। মেঘনার পাড়ে চারতলা হটল।

ঃ তোমাদের আপ্যায়নেই নিয়ে চলো।

রিকশা চললো। জাবেদ সাব রাস্তার দু'পাশের নতুন নতুন ঘর বাড়ী দোকান–পাট দেখেন আর অবাক হন। কে বলে জাবেদ ইকবাল এ ভৈরব বাজারকে চেনেন?

আসরের নামাজ পড়ে 'আপ্যায়ন' থেকে বেরুলেন জাবেদ ইকবাল। তার পুরানো জায়গাটাকে নতুন করে দেখছেন আর ভাবছেন কি করে সুরুজ মিয়ার খোঁজ পাবেন? কে দিতে পারবে তার পরিচয়?

মেঘনার পাড়ে নতুন নতুন দালানকোঠা। আশ্চর্য, কে বলবে এখানটায় ক'বছর আগেও ছিলো বড় বড় টিনের গুদাম! সারা তীর ঘেঁষে তখন আরাগ কোম্পানী হোসেন–কাসেম ব্রাদার্স, দাদা লিমিটেড, লতিফ এণ্ড কোং–এমনি আরো কতো কোম্পানীর সওদাগরী অফিস ও তৎসংলগ্ন বড় বড় গোডাউন–গুদাম ঘর। সবই নাখোদা কোম্পানীর। পূর্ব পাকিস্তানের বাইরে থেকে আসা বড় বড় লোক। অনেক টাকার মালিক।

সে পুর্ব পাকিস্তানও নেই, সেই নাখোদার কাজ-কারবারও নেই। এখন নতুন দেশ, নতুন বেশ, মানুষও নতুন নতুন। এই নতুনের মাঝে পুরানো সুরুজ মিয়াকে তালাশ করে বার করবেন কি করে?

মেঘনার পাড়টায় এখন লোক চলাচল কম। কিছু সৌখিন লোক ধীর মন্থর পদে পায়চারি করছে। মেঘনা ব্রীজের উপর দিয়ে ওই একটা মাল গাড়ী বুঝি যাচ্ছে গড় গড় আওয়াজ তুলে। কয়েকটা গদী ঘরের মালিক খালি গায়ে, লুংগী পরে বালিশে হেলান দিয়ে কাত হয়ে আছে–উপরে ঘুরছে ফ্যান। লঞ্চ ঘাটের উত্তর পাশে, আন্দাজ করে একটা ঘরে ঢুকলেন জাবেদ সাব।

ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম।

ঃ ওয়া আলায়কুমস্‌ ছালাম। হন্তদন্ত হয়ে উঠে লুঙ্গী ঠিকঠাক করে বসলেন ঘরের মালিক।– আপনি কি চান? কা'কে চান?

সামনের একটা চেয়ারে বসতে বসতে জাবেদ সাব বলেনঃ আচ্ছা এখানে আরাগ, মানে আবদুর রহমান–আবদুল গণী কোং এর অফিস ছিলো না?

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, সে তো আপনার পাকিস্তান আমলের কথা।

ঃ হুঁম–আমি সে আমলেরই একজন লোক খুঁজছি।

ঃ আরে, একি তাজ্জবের কথা কন আপনি! স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় না-খোদারা যে ভৈরব ছেড়েছে, আর তো ফিরে আসেনি কেউ।

ঃ না–না, নাখোদা লোক চাইছি না। এখানকার এই ভৈরবেরই এক সুরুজ মিয়া 'আরাগ' কোম্পানীতে চাকুরী করতো, আমি সেই সুরুজ মিয়াকে তালাশ করছি।

ঘরের মালিক এবার বিশেষ দৃষ্টিতে, খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগলেন জাবেদ ইকবালকে– দামী বুশ্‌সার্ট প্যান্ট পরা, বেঁটে মোটা কিন্তু অত্যন্ত ফর্সা। লোকটির বয়েস ষাটের কম হবে না। দেখেই মনে হয় লোকটা অবাঙ্গালী অথচ কি অবলীলায় বাংলা বলে যাচ্ছে। লোকটা আসলে কি? ইন্‌কাম ট্যাক্সের লোক নয় তো?

ঃ সুরুজ মিয়া!–অ, সুরুজ মিয়া, তা আপনি তাকে চিনেন কি ভাবে?

ঃ আমি এক সময় এখানে আরাগ কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলাম। সুরুজ মিয়া আমার কেরানী ছিল।◆

মালিক কতক্ষণ মৌন থেকে চিন্তা ভাবনা করে বলেনঃ আচ্ছা সুরুজ মিয়ার বাড়ী কোথা বলতে পারেন?

ঃ দেখুন, সে তো অনেক আগের কথা। অফিসে আসতো, কাজ করতো, বাজারেই একটা বাসা করে থাকতো জানতাম। বাড়ী কোথা ছিল ঠিক বলতে পারবো না।

ঃ আচ্ছা, সে কবছর আগের কথা বলছেন?

ঃ এই ধরুন–পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের কম হবে না।

ঃ ও, আল্লাহ, সে যে তা হলে বড় সাংঘাতিক কথা। তা'ছাড়া আমাদের ভৈরবে সুরুজ মিয়া নামের কতো মানুষ আছে, আপনি গ্রামের নাম বলতে না পারলে খুঁজে বার করা কঠিন হবে।

ঃ কিন্তু আমার যে সুরুজ মিয়াকে বার করতেই হবে। অতো দূর থেকে এলাম তো শুধু তার সাথে দেখা করার জন্যেই।

ঃ আপনি কোত্থেকে এসেছেন?

ঃ এসেছি ভাই অনেক দূর–ইণ্ডিয়ার সেই বোম্বাই থেকে।

ঃ বোম্বাই থেকে! অবাক না হয়ে পারে না সে। –তাহলে আপনি এক কাজ করুন। ওই একটু দক্ষিণে যান–দেখবেন হাজী কাসেম আলীর গদী। ওই ঘরে গিয়ে একটু খোঁজ নিন। তারা নাখোদার সাথে কায়কারবার করতো।

কেবল হাজী কাসেম আলীর গদীতেই নয়, মাগরেবের আজান পর্যন্ত অনেকের গদীতে তিনি খোঁজ করলেন। কেউ সুরুজ মিয়ার সঠিক খবর দিতে পারলো না। সবারই ওই এক কথা– ওই বন্দরের আশপাশ গ্রাম–কালিপুর, কমলপুর, ভৈরবপুর, চণ্ডিবের, গৌরীপুরে তো কত সুরুজ মিয়া। তাছাড়া সেই সুরুজ মিয়া তো ইতিমধ্যে পরলোকেও চলে যেতে পারেন।

এ কথা শুনে জাবেদ ইকবাল তীব্র প্রতিবাদ করে বলে উঠেন–

ঃ না-না অসম্ভব। সুরুজ মিয়া মরতে পারে না। ওর সাথে সাক্ষাৎ না হলে আমিই যে মরে যাবো। জানেন না, আমার ভিতর কী অসহ্য যন্ত্রণা। বুঝতে পারছেন না সুদূর বোম্বাই থেকে ছুটে এসেছি কোন্ জ্বালায়? না-না, সুরুজমিয়ার সাথে আমার দেখা হতেই হবে।

রাতে এশার নামাজ পড়ার জন্য বন্দরের বড় মসজিদে গিয়ে জাবেদ ইকবাল ইমাম

সাবের সাহায্য কামনা করেন। ইমাম সাব 'ফরজ' নামাজ শেষ করে জাবেদ সাবের আগমনের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে সুরুজ মিয়াকে 'আপ্যায়নে' পাঠাবার কথা বললেন এবং সবাই যাতে এই বিদেশী মুসাফিরকে এ কাজে সাহায্য করে তার জন্যেও অনুরোধ করলেন।

রাতের বেলা মেঘনার তীরে চারতলা 'আপ্যায়নে' ঘুমুতে গিয়ে জাবেদ সাবের বারে বারে মনে পড়তে লাগলো সুরুজ মিয়ার কথা।

সুরুজ মিয়ার সামান্য কথাটি পঁচিশ বছর পর জাবেদ ইকবালের কাছে বড় অসামান্য হয়ে ধরা পড়ে। সেই অসাধারণ কথার তোড়েই সুদূর বোম্বাই থেকে এ বৃদ্ধ বয়সে তিনি ছুটে এসেছেন মেঘনা পাড়ে। জাবেদ ইকবাল আরাগ কোম্পানীর ম্যানেজার তখন। বয়েস তিরিশের কোঠায়। সুরুজ মিয়া তার আফিসের কেরাণী–সরকার। কুড়ি একুশ বছরের যুবক। কিন্তু বড় ধার্মিক। নিয়মিত নামাজ পড়ে। কারো সাথে অতিরিক্ত কথা বলে না। তবে অফিসের কাজ-কামে খুব পাকা। সেবার করাচী থেকে এক বার্জ বোঝাই লবণ আসার পর হঠাৎ করে লবণের বাজার পড়ে যায়। আরাগ কোম্পানীর বিশ হাজার টাকা লোকসান হওয়ার উপক্রম। ম্যানেজার দিশেহারা হয়ে সরকার সুরুজ মিয়াকে বললেনঃ আপনি এভাবে একটা রিপোর্ট লিখে দিন যে, যে ব্যাগে করে লবণ আনা হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই ডেমেজড ছিলো। ফলে অর্ধেক লবণই নষ্ট হয়ে গেছে।

সুরুজ মিয়া এ মিথ্যা কথা লিখতে রাজি হয় না। অনেক তর্কাতর্কির পর শেষে ম্যানেজার বলেই বসেনঃ আমার কথা মতো কাজ না করলে আপনি আমার এখানে কাজ করবেন না।

ঃ রিজিকের মালিক আল্লাহ্। যিনি আমাকে পয়দা করেছেন তিনিই আমার খোরাক জোগাবেন। আপনার কথায় আমি আল্লার সাথে বেইমানী করবো না। আমি কোনমতেই মিথ্যা কথা বলতে পারবো না।

সেদিনই সুরুজ মিয়ার চাকুরী গেলো। আরাগ কোম্পানী থেকে সুরুজ মিয়া যে কোথায় গেলো জাবেদ সাব আর খোঁজ রাখেনি। তার পর জাবেদ ইকবাল ভৈরব ব্রাঞ্চ থেকে খুলনা ব্রাঞ্চ এবং শেষে করাচী হেড অফিসে চলে যান। ষাট বছর বয়সে চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে পিতৃভূমি বোম্বাইতে বসবাস করার সময়, একদা সাগরবেলায় দাঁড়িয়ে অস্তগামী সূর্যকে দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, তাঁর জীবন সূর্যও তো অস্তাচলের পথে। তিনি জীবনে কি পেলেন–কি দিলেন? পেছনে ফেলে আসা দিনের কর্মময় মুহূর্তগুলির কথা স্মরণ করে জাবেদ ইকবালের বড়ো কান্না পেলো। টাকা-টাকা করেই তো সারাটা যৌবন-জীবন শেষ করে দিলেন। বিয়ে শাদী করলেন না। আব্বা-আম্মা মারা গিয়েছিলো পাকিস্তান আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক দাংগায়। আপন বলতে তার কেউ নেই। সেই সাগরবেলাতে অশ্রু সায়রে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ তার মন-ভেলা মেঘনা পাড়ের ভৈরবের সুরুজ মিয়ার কাছে গিয়ে ভিড়লো। তার মনে হতে লাগলো, তিনি অন্যায় করেছেন। সুরুজ মিয়াকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে দারুণ অপরাধ করেছেন।

তারপর থেকেই জাবেদ ইকবালের অন্তরে অহর্নিশি এই অপরাধবোধ কাঁটা হয়ে বিঁধতে থাকে। রাত্রদিনের এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আর কোন পথ না পেয়ে জাবেদ ইকবাল

একসময় সিদ্ধান্ত করে বসেনঃ আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমি সুরুজ মিয়ার কাছে যাবো এবং তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তার ক্ষতি পূরণ স্বরূপ তাকে একলাখ টাকা দান করে আসবো।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত বন্দরের এগলি ওগলি ঘুরে, অমুকের গদী তমুকের ঘরে খোঁজ করেও আসল সুরুজ মিয়ার সাক্ষাৎ মিললো না।

দুপুরেরখাওয়া-দাওয়া সবে শেষ করেছে এমন সময় 'আপ্যায়নে' এক লোক এসে জাবেদ সাবকে বললো, কালিপুর গ্রামে এক সুরুজ মিয়া আছে। সে নাকি এক সময় নাখোদার ঘরে সরকারী করতো।

অমনি রিকশা নিয়ে ছুটলেন তিনি কালিপুর।

মেঘনার পাড়ে কালিপুর গ্রামে পৌঁছে এ লোককে সে লোককে বলে জাবেদ সাব ও রিকশাওয়ালা যে ঘরের সামনে গিয়ে পৌঁছলো, কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, এ ঘরে কোন ভদ্র সন্তান থাকে।

ভাঙা তড়জার বেড়া, চালটাও একদিকে হেলে পড়েছে। দু'খানা শক্ত বাঁশ দিয়ে ঠেকা দেওয়া। ঘরের ভিতর থেকে দরজটা ভেজানো। দরজার সামনে গিয়ে রিক্সাঅলা ডাক দিলোঃ ঘরে কে আছেন? দরজটা খুলেন। আপনার লগে দেখা করবার জন্য একজন লোক আইছে।

ঃ কেডা আবার ডাকে? নীরস মেয়েলী কণ্ঠের সাথে দরজা খুলে।

জাবেদ সাব চোখ তুলে দেখলেন, ময়লা ছেঁড়া শাড়ী পরণে এক বর্ষিয়সী মহিলা। আর তারই পাশ দিয়ে দেখা গেলো, ঘরের মেঝেতে একটি মানব সন্তান। ছেলে কি মেয়ে বোঝা গেলো না। ময়লা কাঁথা গায়ে কোঁকাচ্ছে।

ঃ এইটা সুরুজ মিয়ার বাড়ী?

ঃ জ্বী, হ্যাঁ।

ঃ তিনি কি বাড়ী আছেন?

ঃনা।

ঃ এখন কোথায় তাকে পাওয়া যাবে? তিনি কি দুপুরে খাওয়ার জন্য বাড়ী আসেন না?

ঃ জ্বি না। সকালে যান সন্ধ্যার পর ফিরেন। তিনি হেইপাড় আশুগঞ্জে সরকারী করেন।

ঃ কার ঘরে কাজ করেন, বলতে পারেন?

ঃ জ্বী, না। তবে শুনেছি, কোন হাজীর গদীতে নাকি ক'দিন ধরে কাজ করছেন।

আর দেরী নয়। কালীপুরের ঘাট থেকেই নৌকা করে চললেন আশুগঞ্জ।

নৌকার মধ্যে জাবেদ ইকবালের বারে বারে মনে হতে লাগলো, সুরুজ মিয়ার এই যে দুরবস্থা, তার ঘর আজ জীর্ণ শীর্ণ ভাঙা, পড়ো-পড়ো, তার স্ত্রীর পরণে ভালো কাপড় নেই– তার সন্তান রোগে শোকে মৃত্যু-যন্ত্রনায় কাত্‌রাচ্ছে–এসব কিছুর মূলে তিনি–তিনিই সুরুজ মিয়াকে এমন দুরবস্থায় ঠেলে দিয়েছেন।

চোখ ফেটে কান্না এলো জাবেদ ইকবালের।

আশুগঞ্জ বাজারে পৌঁছে হাজী সাবের গদীতে সুরুজ মিয়াকে আবিষ্কার করতে করতে বহু সময় চলে যায়। তখন বেলা আর বিশেষ নেই। পরিচয় পেয়ে হাজী সাব নিজেই জাবেদ ইকবালকে নিয়ে যান তাঁর গদীঘরের পেছনে, ছোট্ট একটি কামরায়। কামরাটা বেশ সুন্দর। দরজা না থাকলেও তিনদিকেই জানালা আছে। ঘরের নীচেই মেঘনা। মেঘনার পুলটাও দেখা যায়।

চৌকির উপর পাঁচ ছটা বড় খাতা এপাশে ওপাশে মেলে রেখে আনমনে সুরুজ মিয়া লিখছেন।

হাজী সাবই ডাক দিলেনঃ এই যে সরকার সাব, এদিকে চান।

সুরুজ মিয়া ঘাড় ফিরালো। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, মুখে কালো পাকা দাড়ি গোঁফ,গায়ে ময়লা গেঞ্জি। পরণের লুংগী হাঁটুর উপর গুটানো।

ঃ সুরুজ মিয়া আপনি আমায় চিনতে পারছেন?

চশমাটা নাকের উপর ঠিক করে বসিয়ে সুরুজ মিয়া মনোযোগের সাথে কতক্ষণ দেখলো।

ঃ না তো– ঠিক মনে করতে পারছি না।

ঃ আমি জাবেদ ইকবাল–আরাগ কোম্পানীর ম্যানেজার–মনে পড়ছে?

কতক্ষণ নীরব থেকে সুরুজ মিয়া নির্লিপ্তভাবে ধীরে ধীরে বলে–

ঃ জ্বি– এতক্ষণে চিনতে পারছি।

ঃ আমি আপনাকে ক'দিন ধরে তালাশ করছি। আপনার বাড়ীতেও গেছলাম।

ঃআমাকে তালাশ করছেন? কেন? আমি আপনার কি করলাম?

ঃ অমন করে বলবেন না সুরুজ মিয়া–আপনি আমাকে মাফ করুন। বলতে বলতে জাবেদ ইকবাল এগিয়ে সুরুজ মিয়ার দু'হাত চেপে ধরলেন।

ঃ আমাকে মুক্তি দিন।

ঘটনার আকস্মিকতায় হাজী সাব শুদ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে।

জাবেদ সাব ত্রস্তভাবে হাতের এটাচি খুলে একখানা লেফাফা বের করে সুরুজ মিয়ার দিকে এগিয়ে দিলেনঃ নিন। এটা গ্রহণ করুন। এতে একলাখ টাকার একখানা চেক রয়েছে। আপনাদের বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিলে আপনি টাকাটা পেয়ে যাবেন।

সুরুজ মিয়া তেমনি নিরুত্তর। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ত লেফাফাটির দিকে তাকিয়ে। কোন রা নেই, কোন অনুভূতিও যেনো নেই।

ঃ নিন–গ্রহণ করে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দিন।

সুরুজ মিয়ার কোন ভাবান্তর নেই।

হাজী সাব কোন কিছু না বুঝেই বললেনঃ নিন সরকার সাহেব, আপনার তো টাকা পয়সার খুব অভাব শুনেছি–নিয়ে নিন। টাকাও তো কম নয়– একেবারে এক লক্ষ। সোজা কথা নয়।

ঃ না, না, আমি এই টাকা নেবো না।– দৃঢ় কণ্ঠের জবাব।

ঃ কেন-কেন? জাবেদ ইকবাল মরিয়া হয়ে বলে উঠেন– নেবেন না কেন?

ঃ কেন, শুনতে চান? আপনি যে সুরুজকে টাকা দিতে চেয়েছেন সে সুরুজ ওই পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়া সুরুজের মতোই অনেক আগেই ডুবে গেছে–অস্তাচলে চলে গেছে। পঁচিশ বছর আগের সুরুজ মিয়া আর আজকের সুরুজ মিয়া এক নয়। এই দেখুন, আমাকে এখন পেছনের কামরায় চুরি করে, লুকিয়ে লুকিয়ে লেখতে হয় দুই নম্বর খাতা–যত সব মিথ্যার কাঁসুন্দি।

এই বলে সুরুজ মিয়া একে এক জড়ো করতে লাগলো চৌকির উপর ছড়ানো টুকা খাতা, খতিয়ান খাতা ও তৌজি খাতাগুলি।

জাবেদ ইকবাল ও হাজী সাবের দৃষ্টি বাইরে।

মেঘনার কালো পানিকে ক্ষণিকের জন্য লাল করে দিয়ে ক্লান্ত মলিন সুরুজ তখন সত্যি ডুবছে।

'বিচিত্রা' ঃ ৯ই এপ্রিল ১৯৭৬

রাজসাক্ষী

সেমিনার।

গণ সংযোগ বিভাগের তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার। বিষয় ঃ নৈতিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ঃ আজ আমাদের সব যেতে বসেছে। আমাদের চরিত্র কোথায়? বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চান, বাংলাদেশের সঠিক উন্নতি যদি করতে চান, বুঝলেন, তা'হলে আমাদের প্রত্যেকের চরিত্র ঠিক করতে হবে।

অবসর প্রাপ্ত সেক্রেটারী জনাব হক সাহেব অনর্গল বলে যাচ্ছেন– আজ দেশের সর্বত্র অফিস আদালত, স্কুল কলেজ ব্যবসায়-বাণিজ্য, রেলে-ষ্টীমারে এই যে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষপ্রীতি, বুঝলেন, এত যে ব্যাপকভাবে বেড়েছে, তা কি জন্যে? তার একমাত্র কারণ, বুঝলেন, আমাদের নৈতিকতার অভাব বলে, আমরা প্রত্যেকে চরিত্রহীন বলে।

সেক্রেটারী সাবের সারগর্ভ মূল্যবান কথামালা শ্রোতৃমণ্ডলী সহজে গ্রহণ করছেন বলে মনে হলো না। হলের ভিতর অস্পষ্ট মৃদু কথার ফিস্‌ফিসানী আর একটা চাপা গুঞ্জন যেন ধীরে ধীরে বেড়েই চলছে।

রিটায়ার্ড সেক্রেটারী কিন্তু কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এক নাগাড়ে বলে যাচ্ছেন ঃ আমাদের সমাজদেহের অভ্যন্তরে আজ ঘুষখোর, মুনাফাখোর আর মুনাফেক, বুঝলেন, ক্যান্সার সৃষ্টি করে চলেছে। আর মুনাফেক আমাদের সবচেয়ে বেশী সর্বনাশ করছে। আমরা মুখে বলি এক, বুঝলেন, কিন্তু কাজে করি আর! জানেন, কালামে পাক কোরান শরীফে আল্লাহ্ এ সম্পর্কে কি বলছেন?– প্রশ্নের পর কোন রকম উত্তরের অপেক্ষা না কর জনাব হক সাহেব বিরামহীন বলে যাচ্ছেন ঃ আল্লাহ বলছেন– ইয়া আইয়্যুহাল্‌লাজীনা আমানু, লিমা তাকুলু না মা–লাতাফ্‌আলুন। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যা কর না, তা মুখে বলো না। কাবুরা মাক্‌তান ইন্দাল্লাহি আন্‌তাকুলু মা–লা তাফ্‌আলুন। অর্থাৎ তোমরা মুখে বলবে অথচ কাজের বেলায় তা করবে না, অমন আচরণ আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জনের পথে অত্যন্ত গুরুতর।

রিটায়ার্ড সেক্রেটারীর কথাটা, না, কোরানের বাণীটা কানে বড় বাজলো ঃ কাবুরা মাক্‌তান ইন্দাল্লাহি আন্ তাকুলু মা লা তাফ্‌আলুন। কতোদিন কতো বার – শৈশবে যৌবনে, বার্ধক্যে কতো শতবার এই আয়েতটি পড়েছেন, আবৃত্তি করেছেন, কিন্তু আমিন সাবের, মঞ্চোপরি প্রধান অতিথির আসনে সমাসীন আমিন সাবের আজ এই মুহূর্তে মনে হলো, এর অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ তো কৈ আর কোনদিন কোন সময় তো এমন ভাবে উপলব্ধি করেননি! কি সুন্দর কথা। তোমরা যা কর না, তা বলো কেন? আবার তোমরা বলার সময় মুখে বলবে এক অথচ কাজের বেলায় তা করবে না এমন কাজে তো আল্লাহ্ ভীষণ অসন্তুষ্ট হন।

অথচ নিজে কতোদিন কতোভাবে–আত্মোপলব্ধির আলোকে প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ আমিন সাবের মনে হল– নিজের সাথে মুনাফেকি করেছেন।

অধ্যক্ষ আমিন সাব ভাবতে লাগলেন– বাইরে নীতিবোধের বক্তৃতা দিয়ে ব্যক্তি জীবনে

তিনি নিজেই তো দুর্নীতি করেছেন।

অধ্যক্ষ আমিন সাবের মনের আকাশে হঠাৎ স্মৃতির বিদ্যুৎ খেলে গেলো। চমকে উঠে চোখ খুললেন। আমিন সাব পষ্ট দেখতে পেলেন সব।

দিন দশেক আগে।

আমিন সাব তখন হেড একজামিনার-এর কাজ নিয়ে জবর ব্যস্ত। সকাল বেলা চার পঁচজন অধ্যাপক খাতাপত্র ঘাঁটাঘাটি করে নিরীক্ষণের পর কিছু স্ক্রিপ্ট সংশোধনের জন্য রেখে গেছেন। আমিন সাব তাঁর রুমে খাতা নম্বরের ফর্দ নিরীক্ষকের রিপোর্ট নিয়ে বসে আপন মনে কাজ করছেন। বাইরে দুপুরের খাঁ-খাঁ রোদ। বাসার ভিতরটাও আপাততঃ নীরব। ছোট মেয়েটা তার ছোট ভাইকে শাসাচ্ছে ঃ এই অভী, গোলমাল করো না, দেখছো না আব্বা ঘরে বসে খাতা দেখছেন?

ঃ স্যার বাসায় আছেন?

দরজায় কড়া নাড়ার সাথে অপরিচিত কণ্ঠস্বর।

অনেকটা বিরক্ত হয়েই আমিন সাব খাতাপাত্র গুছিয়ে দরজার দিকে এগুলেন–

ঃ কে?

ঃ আচ্ছালামু আলায়কুম, স্যার।

দরজা খোলার সাথে সাথে আগন্তুকের আকর্ণ বিস্তৃত হাসির মধ্য দিয়ে অভিবাদন বেরিয়ে এলো।

বোর্ডের রফিক সাহেব।

পলকে মনে পড়লো, গেলোবার 'স্ক্রিপ্ট' ডেলিভারীর সময় এগ্‌জামিনেশন সেকশনের এই এসিস্‌টেন্ট রফিক সাব তাঁকে তাড়াতাড়ি খাতাগুলি দিয়েছিলো বলেই বিকালের গাড়ীতে আমিন সাবের ফেরা সম্ভবপর হয়েছিল।

ঃ ওয়া আলায়কুমুস্‌–সালাম।

মনের ক্ষোভ গোপন করে বলতে হলো– আসুন, ভেতরে আসুন।

চেয়ারে বসতে বসতে আমিন সাব অবাক হয়ে বলেনঃ তা' আপনি যে এই অসময়ে আমার কাছে? আজ কি অফিস নেই?

ঃ এসেছি স্যার বড় বিপদে পড়ে। গলার স্বরটাকে আশ্চর্য রকমভাবে বদলিয়ে রফিক সাব বলেন, আমার এক আত্মীয়ের জন্য আপনাকে কিছু বিরক্ত করতে আসলাম স্যার। একটু থেমে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে কথা শেষ করেন–আজ তো রোববার, স্যার, অফিস নেই।

ঃ ও হ্যাঁ, তাই তো–আজ যে রোববার আমার খেয়ালই ছিল না। মনের ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে আমিন সাব স্বাভাবিক হতে শুরু করেন।–তা কি ব্যাপার?

ঃ কি বলবো স্যার–নিতান্ত দায়ে পড়ে, আমার আত্মীয়ের চাপেই আমাকে আজ আপনার কাছে অন্যায় অনুরোধ করতে হচ্ছে, স্যার। রফিক সাব একটু থেমে দম নিয়ে অনেকটা নাটুকে কায়দায় বলেন, আপনি বলেই আসতে সাহস করলাম স্যার। আমাদের তো কতো হেড এগ্‌জামিনারই আছেন। কৈ, কারো কথা তো কেউ বলে না? অথচ আপনার কথা বোর্ডের

সবাই বলাবলি করে। আপনার মতো মানুষ হয় না স্যার। না-না, আপনার সামনে বলে বলছি না, আমরা বোর্ডে কাজ করছি আজ উনিশ বছর–কিন্তু আপনার মতোন এমন অমায়িক, সুন্দর ব্যবহার, মধুর কথা আর দেখিনি, শুনিনি, স্যার।

আমিন সাব চোখ নীচু করে আত্মপ্রশংসায় প্রীত হয়ে নীরবে আত্মতৃপ্তি বোধ করতে থাকেন।

হঠাৎ খেয়াল হয়, আরে এখন তো ঢাকার কোন গাড়ী নেই–রফিক সাব এলেন কিভাবে?

ঃ আচ্ছা, আপনি কোন ট্রেনে এলেন?

ঃ না-না, ট্রেন কোথায়? রফিক সাব ঝটপট বলে উঠলেনঃ ঢাকা থেকে বাহাদুরাবাদ মেইলে যাই মাইমেনসিং সেখান থেকে বাসে এলাম এখানে।

ঃ তা হলে তো অনকে 'ট্রাবল' হয়েছে আপনার।

ঃ কষ্ট কি আর স্যার। –রফিক সাব তাচ্ছিল্যভরে বলেন, যে কাজে এসেছি, তা যদি করে দিন স্যার, তা'হলে এসব ট্রাবল তুচ্ছ, স্যার।

আমিন সাব মুখ তুলে চোখ দিয়েই প্রশ্ন করেনঃ ব্যাপার কি?

রফিক সাব কোন রকম ইতস্ততঃ না করে অবলীলায় বলতে থাকেনঃ আমার এক আত্মীয় স্যার, ওয়েষ্ট পাকিস্তান থেকে এসেছেন গেলোবার। তার সেকেণ্ড মেয়েটা এবার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিলো। ওরা বাঙ্গালী হলেও মেয়েটার জন্ম স্যার লাহোরে, লেখাপড়া করেছে উর্দুতে।'মাদার টাং' বাংলা নয়। ও বাংলায় পরীক্ষা দিয়েছে ইলিমেন্টস্ অব বেংগলী ল্যাংগুয়েজ–বাংলা ভাষা মৌল জ্ঞান বিষয়ে। এটাতে মোটেই ভাল করতে পারে নি, স্যার। অন্যান্য বিষয়ে সেকেণ্ড ডিভিশনের মার্ক পাবে। আপনার হাতে যে পেপার এটাতে যদি 'ফোরটি ফাইভ' পার্সেন্ট মার্ক পায় স্যার, তো মেয়েটা সেকেণ্ড ডিভিশন পাবে, স্যার। আর সেকেণ্ড ডিভিশন হলেই মেয়েটা মেডিকেল কলেজে এডমিশন নিতে পারে স্যার।

বাংলার হেড এগজামিনার অধ্যক্ষ আমিন সাব খানিক নীরব থেকে কী যেনো ভাবেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেনঃ বাংলা ছাড়া আর আর বিষয়ে সে সেকেণ্ড ডিভিশন মার্ক পাবে, আর ইউ শিওর?

রফিক সাহেব হাসি মুখে বলেনঃ আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, মেয়ের মুখ থেকেই শুনুন না,স্যার?

ঃ মেয়ে? মেয়ে কোথা?

ঃ মেয়েটি ও তার আব্বা আমার সাথে এসেছে, স্যার। ওদের হোটেলে রেখে এসেছি। আপনি যদি বলেন তো ওদের আপনার সামনে আনতে পারি, স্যার।

অভাবিত প্রস্তাবে আমিন সাব হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে আমতা আমতা করে বলেনঃ মেয়ের বাপকে নয়, ইচ্ছা করলে মেয়টিকে বাসায় আনতে পারেন। আমার মেয়েরাও কলেজে পড়ে।

ঃ আচ্ছা স্যার, মেয়েটিকে আনছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রফিক সাব।

আমিন সাব এবার একা।

বই-পুস্তক ভরা ছোট্ট ঘরটাতে এই ভর দুপুরে আমিন সাব একা একা বড় অসহায় বোধ করতে থাকেন। কাজটা কি ভালো করছেন? পরীক্ষার্থীকে অতোখানি আস্কারা দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?

কিন্তু পরক্ষণেই উল্টা হাওয়া বইতে শুরু করে।

ছাত্রীটা যদি মেডিকেলেই পড়ে তো ওখানে তো আর বাংলার কোন দরকারই পড়বে না। সব পড়বে ইংরেজীতে। এখন এক বাংলার জন্যে যদি সে সেকেণ্ড ডিভিশন না পায় তো মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে কি করে? আচ্ছা, এখন ছাত্রীটির মার্ক বাড়িয়ে যদি সেকেণ্ড ডিভিশন করা হয় তো কতো খানি অন্যায় করা হবে?

'টু-বি আর নট টুবি'র চিরন্তন দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোলায় আমিন সাব দুলছেন, দুলছেন আর দুলছেন।

এমন সময় ঘরের সামনে রিকসা থেকে নামলেন রফিক সাব। তার পিছনে সালোয়ার কামিজ পরা এক কিশোরী।

ঃ ইনিই আমাদের স্যার–

ঃ আস্‌সালামু আলায়কুম। হাত তুলে মেয়েটি সালাম জানায় এবং সামনে এগিয়ে এসে আমিন সাবকে কদমবুসি করে।

আমিন সাহেব বিগলিত হয়ে বলেনঃ বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক। অপরিচিত ছাত্রীটিকে আশীর্বাদ করে আমিন সাব রফিক সাবের উদ্দেশ্যে বলে উঠেন–আপনি একটু বসুন, আমি ওকে বাড়ির ভিতর দিয়ে আসি।

ঃ ও কে, আব্বা?–সালমা, আমিন সাবের কলেজে পড়ুয়া ছোট মেয়ে এগিয়ে আসে।

ঃ ও তোরই এক বন্ধু। আয়, এদিকে আয়। ওর সাথে আলাপ কর। হ্যাঁ, বস এখানেই বস।

সালমা মেয়েটিকে নিয়ে পাশের খাটে বসে।

আমিন সাব দরজায় দাঁড়িয়ে থেকেই বলেন, তোমার নাম মা?

ঃ শাহনাজ পারভীন।

নামোচ্চারণের বিশিষ্ট ধ্বনিতে আমিন সাব স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, মেয়েটি বাঙালী নয়।

ঃ তুমি কি বাংলা লিখতে পারো?

ঃ কুছু–কুছু পাড়ি–বেশী পাড়ি না, স্যার। অবাঙালী সুলভ বাঙলা উচ্চারণ পারভীনের কণ্ঠে।

সালমা মুখ টিপে হাসতে থাকে।

ঃ তোমরা বাংলাদেশে এলে কখন?

ঃ আমরা তো এলাম লাষ্ট ইয়ারে। এখানে এসে পরথম বাংলা লিখতে থাকলাম, কলেজে এডমিশন নিলাম এবং ....

ঃ তোমার আর ভাই-বোনরা কি পড়ে?

ঃ আমার তো কোন ভাই নেই। আমার বড় বোন লাহোর মেডিকেল কলেজে পড়ে।

ঃ লাহোর!

ঃ জ্বি স্যার। আমরা তো ছিলাম লাহোর–ওটাই আমার বার্থ প্লেস। আমারও এমবিশন ডক্টর হই–

ঃ ও তুমি আই এস সি পরীক্ষা দিয়েছো?

ঃ জ্বি স্যার। আমার কম্‌বিনেশন পেপারগুলো ভালো হয়েছে। বেঙ্গলীতে সেকেণ্ড ডিভিশন মার্ক পেলে, আমি ইন্‌শাল্লাহ সেকেণ্ড ডিভিশন পাবো স্যার।

আমিন সাব মৃদু হাসতে থাকেন–তাই নাকি?

ঃ জ্বি, স্যার। আপনি একটু কন্‌সিডার করলে–শাহনাজ পারভীন হঠাৎ খাট থেকে উঠে দাঁড়ায়–কাইণ্ডলী আমাকে মেডিকেল পড়ার একটা চান্স দিন, স্যার।

ছোট মেয়েটির আকুল আবেদনে আমিন সাব, বাংলার প্রধান পরীক্ষক অধ্যক্ষ আমিন সাব কেমন যেনো বিব্রত বোধ করতে থাকেন। সংকট কাটাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠেন–হ্যাঁ, সে হবে খন–সে হবে। তুমি বস, বস মা। সালমার সাথে গল্প করো–

ঃ এইবার নৈতিকতা সপ্তাহের গুরুত্বের উপর সারগর্ভ বক্তব্য রাখবেন স্থানীয় কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ জনাব আল আমিন সাহেব।

মাইকে তাঁর নাম শুনে আমিন সাব চমকে উঠেন। সামনে চোখ তুলে দেখেন, অবসরপ্রাপ্ত সচিব জনাব হক সাহেব 'ডায়াস' থেকে নেমে ধীরে ধীরে তাঁর আসনের দিকে চলছেন।

পাশে ঘাড় ফেরাতেই সভাপতি, মহকুমা প্রশাসক তাঁকে চোখের ইশারা করছেন–যান প্রিন্সিপ্যাল সাব, নৈতিকতার উপর আপনার বক্তব্য এবার শোনান–

আমিন সাব দাঁড়ান। চেয়ার ছেড়ে ডায়াসের কোণায় লেকচার ষ্ট্যাণ্ডের দিকে পা বাড়ালেও প্রতি মুহূর্তে আমিন সাবের বিবেক বলতে লাগলোঃ শাহনাজ পারভীনের প্রাপ্ত পঁয়ত্রিশ মার্ককে বাড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ করা হলো তাতে কি হেড এগজামিনারের নৈতিকতার বরখেলাপ করা হয়নি? মাইকের কাছে দাঁড়িয়ে সামনে চোখ তুললেন প্রধান অতিথি জনাব অধ্যক্ষ সাহেব।

আশ্চর্য! মিলনায়তনের অতোশত মানুষের মাঝে তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠলো মাত্র দুটি মুখ–বোর্ডের এসিসটেন্ট রফিক সাহেব ও পরীক্ষার্থী শাহনাজ পারভীনের সুখী চেহারা।

দু'টি পরিতৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবতে যাবেন, আমিন সাবের কানে ঝংকৃত হলোঃ

ইয়া আইয়্যু হাল্ লাজিনা আমানু লিমা তাক্বুলুনা মা–লা তাফ্ আলুন।

এক অজানা কিন্তু অনিবার্য আজাব-ভয়ে শিহরিত হলেন আমিন সাব। সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। আর ঠিক তক্ষুণি যান্ত্রিক গোলমালে মাইক বিশ্রীভাবে চীৎকার করে উঠলোঃ কূঁ–উ–ত্

হাসির হল্লোড়ে ভরে উঠে সারা 'হল'।

চমকে উঠে সম্বিত ফিরে পান প্রধান অতিথি। সম্বিত পাওয়ার সাথে সাথেই শরমে

লজ্জিত হয়ে গলা খাঁকারী দিয়ে ভাষণ দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

ঃ সমবেত সুধীবৃন্দ, আজ আমাকে মাফ করবেন। মাফ চাইছি, নৈতিকতার উপর আজ আমি কোন বক্তব্য ব্যক্ত করতে পারছি না বলে।

এতটুকু বলেই অধ্যক্ষ আমিন সাব হঠাৎ থামলেন। সবাই ভাবলো, এই বুঝি তিনি মাইকের সামনে থেকে সরে যাবেন। কিন্তু না, অধ্যক্ষ আমিন সাব মাইকের সামনে থেকে নড়লেন না। খানিক নীরব থেকে আবার মুখ খুললেন। বললেন ধীরে ধীরেঃ আমি মনে করি নৈতিকতার উপর বক্তব্য রাখার অধিকার আমার নেই–অধিকার নেই তারও যে আমার মতোনই দুর্নীতিপরায়ণ। যিনি আমার মতোই মুখে বলেন এক, কিন্তু করেন আরেক। অথবা যা করা হয় না, তার কথাই বলা হয় বেশী বেশী। আমার মতোন যারা মুখের কথাকে কাজে দেখাতে পারে না, সেই সব মুনাফেকদের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক বলেছেন–লিনা তাকুলুনা মা–লা তাফ্ আলুন– তোমরা যা কর না, তা বলো না। আমি যা করি না, করতে পারছি না, সে সম্পর্কে বলবো কোন্ সাহসে? কোন যুক্তিতে? তাই বলছিলাম, সুধীবৃন্দ–আসুন, আমরা প্রত্যেকে আগে সৎ হই, নীতি পরায়ণ হই, তারপর চলনু নৈতিকতার উপদেশ দিই, নৈতিকতা সপ্তাহ পালন করে বড়ো বড়ো সেমিনার করি–

এ কথা বলেই সত্যি সত্যি এবার প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ আমিন সাব মাইকের সামনে থেকে সরে পড়লেন।

চঞ্চল করতালি ও সরব উল্লাস ধ্বনিতে ভরে উঠলো 'হল'।

প্রধান অতিথি ধীরে ধীরে আসনটিতে ফিরে এসেই পাঞ্জাবীর জেব থেকে রুমাল বার করে চোখ মুখ ও কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন।

ঘর্মাক্ত চোখ মুখ মুছে সামনে তাকালেন আমিন সাব।

আশ্চর্য। তখনো আনন্দ উল্লাস সবার চোখে মুখে খুশীর ঢেউ তুলে চলেছে। তখনো সারা হল ঘরে আনন্দ গুঞ্জন।

আমিন সাব অতোক্ষণে তৃপ্তিবোধ করলেন। তৃপ্ত হলেন শ্রোতাদের আনন্দ মুখর অবয়ব দেখে নয় (কেননা, তারা তো খুশী হয়েছে ভাষণ সংক্ষিপ্ত হয়েছে বলে, বক্তৃতা পর্ব যত সংক্ষিপ্ত হবে 'বিচিত্রা পর্ব' তত তাড়াতাড়ি শুরু হবে যে।) প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ জনাব আমিন সাহেব খুশীর সাথে পরম তৃপ্তি লাভ করছেন স্বীয় অপরাধের কথা, আত্মদোষের কথাটা আজ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে পারলেন বলে।

'হল ঘরের' চারিদিকে তখনো একটি অনির্বাণ অনুরণন অক্ষয়ভাবে ঘুরে মরছেঃ লিমা তাকুলুনা মা–লা তাফ্আলুন–তোমরা যা কর না, তা বলো না।

অধ্যক্ষ আমিন সাব দু'চোখ বুঁজে মনে মনে বলে উঠলেন–আমিন! আমিন!

'অলক্ত' ঃ বৈশাখ ১৯৮৫

ডায়রীর পাতা থেকে

ক. পাঞ্জাবী মিলিটারীর মহানুভবতা (?)

১৯৭১ সালের আগষ্ট মাস। ৭ তারিখে কালিকচ্ছ থেকে তিনজন হিন্দু সহ ছ'সাতজন লোককে মিলিটারীরা ধরে কুমিল্লা কেন্টনমেন্টে নিয়ে যায়। পরে ৩০শে আগস্ট তারিখে হিন্দু ভদ্রলোকসহ সবাইকে মিলিটারী অফিসার আবার ছেড়েও দেয়। অবাক–সবাই রীতিমত অবাক, পাঞ্জাবী মিলিটারী হিন্দুকেও ছেড়ে দিলো? ব্যাপার কি? ঘটনা জানার জন্য গলানিয়ার পথে কালিকচ্ছ গ্রামে শিবু দত্তের সাথে দেখা করলাম। শিবু দত্ত (শিবেন্দ্র কুমার দত্ত গুপ্ত) বললেন ঃ ১৬ই শ্রাবণ বিস্যুদবার সকালে পাঞ্জাবীরা আশু দত্ত মজুমদারের স্ত্রী মায়ারাণী দত্ত মজুমদার, হীরুনন্দীর স্ত্রী বেলা রাণী নন্দী রায় ও তার তিন বছরের কন্যা ঝুমু নন্দী, মহারাজ মিয়া, কালামিয়া ও গলানিয়ার চান্দ আলী মিয়াসহ আমাকে গ্রেফতার করে। পাঁচদিন সরাইল থানার হাজতে কাটাই। সেখান থেকে ৩/৪ দিন ট্রাকে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মিলিটারী ক্যাম্পে আনা-নেওয়া করে অবশেষে আমাদেরকে কুমিল্লা কেন্টনমেন্টে পাঠায়। সেখানে আমরা অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করি। তবে আমার বা মহিলাদের উপর কোন রকম শারীরিক নির্যাতন করা হয়নি। সেখানে এক পাঞ্জাবী মেজর আমাকে সাত-আট দিন নানাভাবে জেরা করেন। আমি সাহস সঞ্চয় করে আমার 'বিপ্লবী' পূর্ব পুরুষ উল্লাস কর দত্ত, বীরেন্দ্র দত্ত, দ্বীজদাস দত্ত ও শুভসাগর দত্তের কাহিনী বলি। একদিন আমি মেজরের প্রশ্নের জবাবে বলি ঃ আমি আমার মাতৃভূমিকে ভালবাসি– সে জন্যই আমি দেশ ছেড়ে ইণ্ডিয়া যাইনি।

মেজর বললেন ঃ তোমাকে মারার জন্য এখানে আনা হয়েছে। এখন তোমাকে কে বাঁচাবে?

আমি নির্ভয়ে বললাম ঃ এতদিন– এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত যিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেই আল্লাই আমাকে বাঁচাবে।

মেজর সাহেব চমকে উঠে বলেন ঃ কি, কি বল্লেন?

ঃ আল্লাই আমাকে বাঁচাবে।

মেজর সাহেবের চোখ সজল হয়ে উঠলো। তিনি আবার বলে উঠলেন ঃ এত্না বিশওয়াস?

আমিও বলতে পারবো না তখন কোথা থেকে সাহস পাই। মেজরের কথার পিঠে-পিঠে বলে ফেলি ঃ আজ্ঞে স্যার– এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মেজর আর কোন কথা বল্লেন না। চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তার পরদিনই আমাকে এবং আমার সাথে সাথে আমাদের দলের সবাইকে 'মুক্ত' করে দিলেন।

খ. আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী

১৬ই নভেম্বর জেল পরিদর্শন করতে যাই। ক'জন বন্দী ও 'মুক্তি'র সাথে সাক্ষাত ও আলাপ। সেখানে বন্যার মাষ্টার শাস্ত্রসিন্ধু (শ্রী অমর চন্দ্র দাস শাস্ত্রসিন্ধু) মহাশয়কেও দেখলাম। গোসল শেষে ভিজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জপ করছেন। ফেরার পথে তাঁর সাথে আলাপ করি। তিনি

বাইরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বুঝিয়ে বলি– জেলে আছেন তাই প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছেন। বাইরে গেলে আর নিস্তার নেই– হিন্দু হওয়ার অপরাধে আপনার মৃত্যু অনিবার্য

তিনি বিশ্বাস করলেন। আশ্বস্ত হলেন। তাঁর গায়ের জামা নেই, পরণের কাপড় নেই। কথা দিয়ে এলাম তাঁর জামা কাপড় আমি দেবো।

দুঃখ লাগে ভাবতে, কি ফিটফাট থাকতেন এই লোক। আর আজ সেই ফুল বাবুটি ছেঁড়া কাপড়ে কষ্ট ভোগ করছেন। সবচে' অবাক লাগে, মানব ভাগ্যের আচানক ব্যাপার দেখে। এই শান্ত্রসিন্ধু মহাশয় নিজেই এককালে জেলের কর্মচারী (ডেপুটি জেলর) হিসেবে কতো লোককে বন্দী করেছেন– আর আজ সেই জেলর সাব নিজেই জেলে বন্দী। তবে সুখের কথা বর্তমান জেলর (মোহাম্মদ ইসলাম) শান্ত্রসিন্ধুর প্রতি সুনজর দিচ্ছেন তাঁর জন্য 'বিশেষ খাবার' দুধ-রুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

কথায় কথায় শান্ত্রসিন্ধু বললেন– ভাববেন না, আগামী ১৯শে পৌষ থেকে শেখ মুজিবের অবস্থা ভালর দিকে যাবে।

বাসায় এসে কেলেন্ডার খুলে দেখলাম, ১৯শে পৌষ হয় ১৯৭২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী।

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীকে আমরা বিশ্বাস করি। কেননা, সংগ্রামের প্রথম দিকে তিনি যে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা' অক্ষরে অক্ষরে মিলে।

মার্চের প্রথম দিকে ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের পর বৈঠক করে চলেছেন। আমরা সুফল আশা করছি। শান্ত্রসিন্ধু বল্লেন— আপনারা বৈঠকের ফলাফল সম্বন্ধে দিন গুণছেন। আমি তো দেখছি এ আলোচনা ব্যর্থ হবে। আমি রক্ত দেখছি। দেখবেন, সারা বাংলাদেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে যাবে।

আর একদিন। প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে বাসায় এলেন শান্ত্রসিন্ধু। বন্যা ও ঝর্ণাকে কাছে ডেকে নিয়ে বল্লেন ঃ তোমাদের দেখতে এলাম– আর হয় তো দেখা হবে না। আগামী ১১ই চৈত্র হ'তে পাকসেনা বাঙ্গালী হত্যা শুরু করবে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমায় ডেকে নিয়ে বল্লেন ঃ আপনারা কোথায় যাবেন ঠিক করুন। ১৪ই চৈত্র থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিমান আক্রমণ হবে।

আশ্চর্য, ১১ই চৈত্র (২৫শে মার্চ) ঢাকায় ও ১৪ই চৈত্র (২৮শে মার্চ) থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে সত্যি সত্যি পাক বাহিনীর আক্রমণ তথা 'রক্তগঙ্গা তৈরী শুরু হয়।

এবার দেখা যাক ১৯শে পৌষ থেকে শেখ সাহেবের সুদিন অর্থাৎ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তির কোন সুরাহা হয় কি না!

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়লো।

এপ্রিলের প্রথম দিক। আমরা তখন গলানিয়ায়। একদিন কালিরবাজার এসে দেখি, সব মানুষ মিলে কচুর পাতা দেখছে। ব্যাপার কি?

ঃ এই দেখুন স্যার– আমাকে একজন বলে– কচু পাতার মধ্যে বাড়ির দাগ।

আমি কচু পাতার উল্টা পিঠে দু'তিনটা রেখা দেখলাম ঠিকই।

ঃ জানেন স্যার, পাঞ্জাবীরা মারধর করলে হবে কি, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।

ঃ তা' কচু পাতার সাথে স্বাধীনতার কি সম্পর্ক?

ঃ তা-ও শুনেন নাই? লোকটি সোৎসাহে বলতে থাকে– সেদিন কুমিল্লা–ময়নামতির রাস্তা দিয়ে এক বাঙালী 'ফকির' যাচ্ছিলেন। নরাধম পাঞ্জাবী মিলিটারী তাঁকে বন্দুকের বাট দিয়ে মারধর করে। তখন ফকির হাসতে হাসতে বলে– আরে বুর্বক, আমার গায়ে বাড়ি দিলে হবে কি, তোমাদের এ বাড়ি তো পড়ছে সব কচু পাতার উপর। পাঞ্জাবী মিলিটারী রাস্তার পাশের কচু পাতা এনে দেখে, সত্যিই তো কচু পাতার পিঠে অনেকটি দাগ পড়েছে। তারা অবাক হয়ে 'ফকির'কে তালাশ করে। কিন্তু ফকির ততোক্ষণে অদৃশ্য।

দেখলাম, সবাই কচুপাতা দেখছে আর স্বাধীন বাংলার স্বপ্নে উল্লসিত হয়ে উঠছে।

তার মাস খানেক পর দেখি আরেক ছবি।

তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। গ্রামের সব জাম গাছে নতুন ধরনের এক 'গোটা' দেখা গেলো। রক্ত বর্ণের ছোট ছোট লাল গোটা। আমরাও জাম গাছ থেকে সে গোটা সংগ্রহ করি। কিন্তু ব্যাপার কি?

সবাই বিশ্বাস করছে ঃ বাংলাদেশে আরো রক্তপাত হবে, মানে পাঞ্জাবী মিলিটারী আমাদের দেশে আরো মানুষ মারবে। মানুষের রক্তের 'আলামত'ই দেখাচ্ছে খোদা জাম গাছে রক্তের গোটা দিয়ে।

গ্রামের সবাইকে দেখলাম, জাম গাছের দিকে তাকিয়ে অজানা ভয়ে ত্রাসে ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে।

কিন্তু তার কিছু দিন পরই আরেক কান্ড দেখে গ্রামের লোক সবাই বিজয়ের আশ্বাসে গভীরভাবে আশ্বস্ত হয়ে উঠে। মিলিটারী যতো অত্যাচারই করুক, ঘর-বাড়ি পুড়াক, আর মানুষ ধরে নিক– বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবেই।

কেমন করে তাদের এ বিশ্বাস জন্মালো?

কালির বাজার থেকে শামসু, ফজলু, আলাউদ্দিন ফিরে এসে খুশীতে আপ্লুত হয়ে আমাদের জানায় ঃ পরীক্ষায় পাশ। 'বঙ্গবন্ধু' পাটায় মানে সিংহাসনে বসবেনই।

ঃ তার মানে?

ঃ তার মানে হলো– ছাত্রদের একজন বলে– আসেন, পরীক্ষা করে হাতে কলমে দেখাই।

তারপর তারা আমার সামনেই ওঘর থেকে একটা পাটা মানে মরিচ পেষার পাথরের পাটা আনলো। আরেকজন আনলো একটা পিতলের বদনা।

পাটা ও বদনা আমার সামনে রেখে একজনকে বললো কিছু মাটি আনতে।

ইতোমধ্যে বহু লোক জমে গেছে।

তারা পানিতে মাটি গুলে পাটার উপরটা বেশ পুরো করে মাটিতে লেপে দিয়ে বললো ঃ এই দেখুন। এত বড় পাথরের পাটার উপর মাটির মাঝে আমি এই ছোট বদনাটা দাঁড় করাচ্ছি। এই বলে বদনার নিচের দিকটা পাটার সাথে সংযোগ করে মাটিতে লেপে দিলো।

ঃ এইবার আমি বদনাটা দু'হাতে ধরে উপরে তুলবো। আলাউদ্দিন বলে– বদনার সাথে যদি এই ভারী পাটাটাও উপরে উঠে আসে, তা'হলেই বুঝবেন, শেখ সাব আমাদের বাংলার পাটায়

বসবে।

আশ্চর্য, বদনাটা উপরে তোলার সাথে সত্যি সত্যি ভারী পাথরের পাটাও উপরে উঠে এলো।

সবাই সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো ঃ শেখ মুজিব জিন্দাবাদ— বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

গ. বুদ্ধিজীবী হত্যা

৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার। সকাল থেকে নরনারী শিশু উদ্বাস্তু মানুষ দক্ষিণ দিক থেকে গলানিয়ার দিকে আসছে। ব্যাপারকি? বাড়িঘর ফেলে আসা সোহাগপুর বাহাদুর পুর–তালশহরের লোকের মুখে শুনলাম, পাক বাহিনী পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে আশুগঞ্জের দিকে পিছু হটছে এবং গ্রামের লোকজনকে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র যেতে বলছে। তবে পাক বাহিনী এখন কোন রকম অত্যাচার করছে না। দশটার দিকে কালির বাজারে গিয়ে শহরের খবর পাই। সদ্য শহর থেকে ফেরা লোকের মুখে শুনি– ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে একটি পাঞ্জাবী সৈন্যও নেই। মানুষজনও নেই। জনহীন, শূন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর। তবে হ্যাঁ, ওরা শহর ছেড়ে যাওয়ার সময় কলেজ হোষ্টেল, অন্নদা স্কুলের বোর্ডিং হাউসের মিলিটারী রেশন গোদামে আগুন দিয়ে যায়। সাহসী লোকেরা ঐ সব গোদাম ঘর থেকে আটার বস্তা, তেলের টিন ইত্যাদি লুট করছে। পাঞ্জাবীর পশ্চাদপসারণের খবরে সবাই যখন আনন্দের বাতাসে হৈ-হুলোড় করছে ঠিক তখনই একজন এসে বললো ঃ সর্বনাশ হয়ে গেছে। পাঞ্জাবী শালারা যাওয়ার আগে গেলো রাতে প্রফেসর লুৎফর রহমান স্যারকে মেরে গেছে।

একে একে আরো খবর আসে। কেবল প্রফেসর লুৎফর রহমানই নয় সরাইলের এডভোকেট সৈয়দ আকবর হোসেন (বকুল) ও তার ছোট ভাই সৈয়দ আফজল হোসেনসহ বহু লোককে গত রাতে জেলখানা থেকে নিয়ে কুড়ুলিয়াখালের পাড়ে গুলী করে মেরেছে।

একজন বলে ঃ ওই দলে সরাইলের হারু ডাক্তার (ডাঃ হারুণ রশিদ) ও ছিলেন। আল্লার কুদরত– অলৌকিকভাবে হারু ডাক্তার রক্ষা পেয়েছেন। তিনি বেঁচে আছেন।

তিনি বাঁচলেন কি ভাবে?

হারু ডাক্তার ও প্রফেসর লুৎফর রহমান দু'জনকে একই দড়িতে হাত বাঁধা হয়। রাত্রি বেলা অন্ধকারে জেলখানা থেকে ট্রাকে করে কুড়ুলিয়া খালের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি প্রফেসরকে পালাবার পরামর্শ দেন– কিন্তু প্রফেসর রাজী হন না। ওয়াপদার ওখানে গিয়ে ট্রাক থেকে নামিয়ে ওদেরকে যখন সারিবদ্ধভাবে ক্ষেতের আইল দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, হারু ডাক্তার তখন হাতের বাঁধন খুলে ফেলে হঠাৎ পশ্চিম দিকে ক্ষেতের মধ্যে দেন দৌড়। একেই বলে ভাগ্য– অন্ধকারে দৌড় দিয়ে তিনি একটা উঁচু আইলের মাঝে পড়ে যান এবং উল্টে গিয়ে অপর পাশে নিচু জমিতে গিয়ে পড়েন। সাথে সাথে মিলিটারী ব্রাস ফায়ার করতে থাকে। ডাক্তার তখন শুয়ে 'ক্রলিং' করে সামনে এগুতে থাকেন। তিনি তো এককালে আর্মির লেফটেন্যান্ট ছিলেন– সেই ট্রেনিংটা এ বিপদের সময় খুব কাজে এলো। বুকে হেঁটে তিনি যখন দাতিয়ারার এক বাড়িতে গিয়ে উঠলেন তখন তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন– পরণে, গায়ে কোন কাপড় নেই। জনমনুষ্যহীন পড়ো বাড়ির এক ঘরে শোলার আঁটির মধ্যে হারু ডাক্তার আত্মগোপন

করলেন।

৮ই ডিসেম্বর বুধবার। ভৈরব অঞ্চলের লোকজন আবার গলানিয়ায় আসতে শুরু করেছে। ভৈরবপুর চণ্ডিবেড় কালিপুর কমলপুর এ সব গ্রামে পাক বাহিনী আশ্রয় নিচ্ছে– লোকজনকে সরতে বলছে। পূব দিক থেকে ভৈরব বাজার, ভৈরবপুর, চণ্ডিবেড় গ্রামেও ইণ্ডিয়ার শেল গিয়ে পড়ছে। জান-প্রাণের ভয়ে সবাই বাড়িঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। কালির বাজারে গিয়ে শুনি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেল থেকে বন্দীরা সব পালিয়ে গেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুক্তিফৌজের দখলে।

সাইকেল নিয়ে ছুটি শহরে। জেল থেকে পালিয়ে বেঁচেছে পৈরতলার শাহজাহান– আমাদের ছাত্রনেতা হুমায়ুন কবীরের বড়ভাই। শাহজাহান একে একে বললো সব ঃ লুৎফর রহমান স্যারকে যেদিন ধরে, তারপর দিনই আমাকে বাড়ী থেকে এ্যারেষ্ট করে। কলেজের ক্যাম্পে শারীরিক নির্যাতন করে আমাকে পাঠিয়ে দেয় জেলখানায়। সেখানে আমরা প্রফেসর লুৎফর রহমান, এডভোকেট সৈয়দ আকবর হোসেন তাঁর ছোট ভাই,হারু ডাক্তার–বহু লোক একই 'সেলে' থাকি একেবারে শেষ ঘরটায়। রাতের বেলা দেখি, এঘর থেকে ওঘর থেকে বেছে বেছে লোকজনকে বেঁধে নিয়ে যায়– ওরা আর ফিরে আসেনা।

বুঝলাম, এভাবে আমাদেরকেও একদিন নিয়ে মেরে ফেলবে। তাই এখান থেকে বাঁচবার চিন্তা করতে লাগলাম।

দিনের বেলা আমরা সেলের বাইরেই থাকি। পুরনো দাগী কয়েদীদের সাথে আলাপ পরিচয় করে ওদের সাহায্যেই পালাবার ফন্দি আঁটলাম। লুৎফর রহমান স্যারকে সব বলি। তিনি রাজী হলেন না। বললেন– না, ওভাবে পালিয়ে গেলে আমরা বাঁচবো ঠিকই কিন্তু আমাদের অবর্তমানে বাকী বুড়ো লোকগুলো সবাইকে মেরে ফেলবে। জেলখানায় তখন তিনশ সাড়ে তিনশ বন্দী। মুক্তিবাহিনীর লোক তো আছেই ইণ্ডিয়ান আর্মির দু'জন সেপাইও আছে। আর আছে পুরনো সাধারণ কয়েদী।

৫ই ডিসেম্বর মাঝরাতে জল্লাদ বাহিনী এসে উপস্থিত। এ সেল ও সেল ঘুরে ঘুরে আমার মত তরুণ দেখে ৫২ জন যুবককে বার করে হাতে বাঁধলো। আমার হাত বাঁধবার সময় আমি কৌশল করে ঢিলা করে রাখি। মনে মনে প্ল্যান করি, রাস্তা থেকে পালাবো।

জেলখানার সামনে আমাদের সবাইকে দাঁড় করিয়ে মিলিটারী বললো– তুম মুসলমান হো?

বললাম–জ্বী হজুর। আমরা মুসলমান।

ঃ কলেমা পড়।

আমরা সবাই কলেমা শাহাদাত পড়লাম।

তার পরেও আমাদের ৫২ জনকে ট্রাকে তুললো। ট্রাক চলার সময় আমি চুপিসারে আমার হাতের বাঁধন ঢিলে করে ওখান থেকে লাফিয়ে পালাবার ফন্দি আঁটলাম। কিন্তু আল্লার কুদরত বুঝে সাধ্য কার?

আমাদের নিয়ে ট্রাকটি ওয়াপদার মিলিটারী ক্যাম্পের গেইটের কাছে থামলো। এক মিলিটারী নেমে গেইট থেকেই কা'র সাথে যেন টেলিফোন করতে লাগলো। আমি পষ্ট শুনতে

পেলাম ফোনে মিলিটারী উর্দুতে বলছে ঃ হাঁ-হাঁ, এরা সবাই মুসলমান। না, না– আমি কোন মুসলমান মারতে পারবো না।

আল্লাহকে হাজার শোকর– কতক্ষণ কথা কাটাকাটির পর মিলিটারী ট্রাক আমাদের সবাইকে নিয়ে ফের জেলখানায় চলে এলো। বধ্যভূমিতে কাউকেই আর নিলো না। তবে আমাদেরকে আগের স্ব স্ব সেলে না রেখে ৫২ জনকেই সামনের ঘরটাতে পুরে দিয়ে গেলো।

সকাল বেলা লুৎফর রহমান স্যারের কাছে সব ঘটনা বলে জেলখানা থেকে পালাবার প্রসংগ আবার তুলি। এখনো তিনি রাজী হন না। সবাইকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তিনি একা বাঁচতে চান না।

সেই দিন রাতেই প্রফেসর লুৎফর রহমান ও অন্যান্যদের তাদের 'সেল' থেকে বেঁধে নিয়ে যায়। আমাদের 'ওয়ার্ড' থেকে মাত্র ইণ্ডিয়ান সেপাই দু'টিকে নিলো। আমরা আল্লার রহমতে বেঁচে গেলাম।

পরদিন মরিয়া হয়ে উঠি– আজ যেমন করেই হোক পালাতে হবেই। এখানে থাকলে আর রক্ষা নেই। আজ রাতেই সবাইকে মেরে ফেলবে। পুরান কয়েদী কেরামত ও আবুকে হাত কললাম। ওদের সাহায্যে রান্না ঘরের খালি ড্রাম দেয়ালের কাছে নিয়ে একটার উপর আরেকটা দাঁড় করাই। কেরামতের কাঁধে চড়ে আমি ড্রামের উপর দাঁড়ালাম এবং সেখান থেকে 'ওয়ালের' মাথা ধরে উপরে উঠলাম। এবার ওয়ালের উপর বসে হাত ধরে টেনে কেরামত ও আবুকে ওয়ালের উপর তুলি। চৌদ্দ ফুট উঁচু 'ওয়াল' থেকে লাফিয়ে পড়লাম নীচে একটা আর্মি বাংকারের উপর। কোন লোক জন নেই। জনমানব শূন্য রাস্তা দিয়ে দৌড়ে গেলাম চেয়ারম্যান গফুর মিয়ার বাড়ি। তখনো শহরের এখানে ওখানে 'শেল' পড়ছে।

গফুর মিয়ার বাড়ির গেইট বন্ধ। গেইট ভেঙ্গে ভিতরে গিয়ে দেখি বাড়িঘর খালি। সব ঘরে তালা ঝুলছে। লাকড়ি ঘরে একটা কুড়াল পেলাম। সেটা নিয়ে ছুটে এলাম জেল খানায়। তিন জন মিলে অনেক চেষ্টা করে জেলের তালা ভাঙ্গি। দরজা খোলার সাথে সাথে জেলে বন্দী সবাই দৌড়াদৌড়ি করে বেরিয়ে গেলো।

আমরা দৌড়তে দৌড়তে বর্ডার বাজারের কাছে পৌছেছি। আমার সংগী বরুণ–বরুণকে চিনলেন না? ওই যে যাত্রাদলের তবলচি, সেই বরুণ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠলো, 'শাহজাহান ভাই, সর্বনাশ, জেলের মধ্যে যে আমার স্ত্রী রয়ে গেছে।

আরে একি কথা? আবার ছুটলাম জেলখানার দিকে। জেলখানা তখন একেবারে খালি। কুড়াল নিয়ে ফিমেল ওয়ার্ডের তালা ভেঙ্গে ভিতরে গিয়ে তো অবাক ঃ বরুনের বউ একেবারে সাদা হয়ে গেছে, পানিতে ওর শরীর থলথলে।

ইণ্ডিয়া যাওয়ার সময় বরুণ ও তার অন্তঃসত্বা স্ত্রী বর্ডারে ধরা পড়ে মাস দুয়েক আগে।

বরুণ ও তার রুগ্ন স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের পৈরতলার বাড়িতেই উঠলাম।

শাহজাহানের কাহিনী শুনে গলামিয়া ফিরে এলাম।

বিকাল বেলা শুনি একটি অশুভ সংবাদ। ছোট সংবাদ কিন্তু বড়ই মর্মান্তিক। কালিকচ্ছের মুক্তি কমান্ডার ফারুক (হিমাংশু) রাজাকার ধরে ধরে 'ঘাঁটি বাড়ি'তে বন্দী করছে আর তাদের

নাক-কান কাটছে। এমনকি কারো কারো চোখও নাকি উৎপাটন করছে।

অসম সাহসী 'মুক্তি'র এসব দুঃসাহসিক নৃশংসতায় শিহরিত হলাম। জিঘাংসা বৃত্তির হিংস্রতা দেখে ও বাংলাদেশের ভবিষ্যত ভেবে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা কি তা'হলে রক্তপাতের উন্মত্ততা? জীবনদান করে স্বাধীনতা লাভ কি অন্যের জীবন হরণের জন্য?

ঘ. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 'বাংলাদেশের পতাকা'

৯ই ডিসেম্বর বিস্যুদবার। সকালের বেতার বার্তায় মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর জয়-জয়কার।বিভিন্ন সেকটর থেকে হানাদার বাহিনীর পশ্চাদপসরণ ও পরাজয়ের খবর আসছে –

– আর আসছে অগ্রগামী মুক্তিফৌজের শহর দখলের সুসংবাদ। জনমনে দারুণ উল্লাস। বাংলারহাট-ঘাট-মাঠ,আকাশ-বাতাস চীৎকার করে বলছে ঃ জয় বাংলা।

জয়োল্লাশের দুর্লভ মুহূর্তগুলিকে প্রত্যক্ষ করার দুর্মর মানসে ছুটলাম শহরে।

রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধা মফিজুল ইসলাম বাদলের সাথে দেখা। পৈরতলার। ফুল ইউনিফর্ম পরা, কাঁধে এল, এম, জি ঝুলানো। আমাকে সালাম করে বলে উঠে ঃ আপনি বেঁচে আছেন, স্যার?

আমি তো অবাক। এ কথা বলছে কেন?

ঃ না, শুনেছিলাম পাঞ্জাবী শালারা যাওয়ার সময় এখানে অনেক বুদ্ধিজীবী হত্যা করে গেছে। সব খানেই গুজব প্রফেসর লুৎফর রহমান স্যারের সাথে আপনকেও মেরে ফেলেছে।

ঃ আল্লাহকে হাজার শোকর। আমি বলি–ব্যাটারা পালাবার আগেই আমি শহর ছেড়ে পালাতে পেরেছিলাম। তা' তোমরা তো যুদ্ধ করলে, দেশকে মুক্ত করলে– তোমরা আছ কেমন?

বাদলের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলো। চোখ হয়ে উঠলো সজল।

ঃ পুরোপুরি খুশী হতে পারলাম না, স্যার। মাত্র দু'টি দিনের জন্য সেলিমভাই তার স্বদেশ ভূমিকে 'স্বাধীন' দেখে যেতে পারলো না।

ঃ সেলিম?

ঃ হ্যাঁ, আমাদের গ্রুপ ক্যাপটিন সেলিম ভাই। এই তো সেদিন। ৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাকুটের যুদ্ধে শহীদ হলেন।

আমি নির্বাক দাঁড়িয়ে বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। বাদল বীরোচিত ভংগীতে বলে যেতে লাগলো সেলিমের কথা। আর আমার মানস চোখে ভাসতে লাগলো ছবির পর ছবি ..... সালেহ মোহাম্মদ সেলিম, চিনাইর হাইস্কুলের বি, এস-সি মাষ্টার। দেশের ডাকে, মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং নেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে চলে গেলো ইন্ডিয়া। স্পেশিয়াল ট্রেনিং নিলো বিহার চাকুলিয়া কেন্টনমেন্টে — ছোট ভাই, মেরাশানী হাইস্কুলের গ্রাজুয়েট টিচার এস, এস, ইউসুফকেও ডাক দিলো ওপার থেকে। ভাইয়ের ডাকে, দেশের ডাকে সারা দিয়ে ইউসুফও চলে গেলো ইন্ডিয়া। দুই সহোদর দুই সেক্টরে থেকে লাঞ্ছিত

মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার আমরণ যুদ্ধে হলো লিপ্ত। গ্রুপ কেপটিন সেলিম তার গ্রুপ নিয়ে চলে এলো নিজ এলাকা বিদ্যাকুট– পাশের রামচন্দ্র নারায়ণ গ্রামে মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের ঘরেই তো তার আশৈশব–বাল্য কাটে। সেই বিদ্যাকুট –আক্ষরিক অর্থেই মাতৃভূমি বিদ্যাকুটেই পলায়নপর হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে করতে সম্মুখ সমরেই প্রাণ দিলো বিদ্যাকুটের সেলিম।

ঃ সেলিম ভাইয়ের কথাই সত্য হলো, স্যার।

ঃ সেলিমের কথা? কোন্ কথা?

ঃ বিদ্যাকুটে আসার পর ওখানকার সাধু বিষ্ণু বর্মণকে সেলিমভাই বলেছিলো– দেশ তো স্বাধীন হবেই, তবে জানবেন, আমার রক্ত না দেওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা আসবে না।

আমরা দু'জনেই চুপ। দেশ স্বাধীন হলো ঠিকই কিন্তু সত্যি সত্যি সেলিমের রক্ত দানের আগে হলো না। এমনি হাজারো সেলিমের শাহাদতেই স্বাধীন বাংলাদেশ।

আমার চোখও সজল হয়ে উঠলো।

শহরে আর গেলাম না।

কালির বাজারে এসে শুনতে পেলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে 'জয় বাংলার' পতাকা উড়ছে। কাছারী প্রাংগনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করেছেন শ্রমিক নেতা চট্টগ্রামের এম, সি, এ জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী। আমরাও দূর থেকে মনে মনে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পতাকাকে সালাম জানিয়ে বলে উঠলাম ঃ আমার সোনার বাংলা– আমি তোমায় ভালবাসি। জয় বাংলা।

৬. গণকবর

শহরে ফিরে এলাম। নতুন শহর। হ্যাঁ ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমার কাছে সত্যই নতুন শহর বলে প্রতিভাত হলো। এ'কে কতো ভাবে কতো রুপেই না দেখলাম। শৈশব-বাল্যে বৃটিশের হিন্দু শহর, যৌবনে পাকিস্তানের মুসলিম শহর, একাত্তুরের নয় মাস হানাদার পাক বাহিনীর ফৌজি শহর আর এখন দেখছি স্বাধীন বাংলার পতাকা-শোভিত ভারতীয় সৈন্যের শহর। মূক-বধির স্কুলের সম্মুখস্থ এডভোকেট বদরুদ্দিন চৌধুরীর বাড়ীতে শিখ সৈন্য। বাড়ীর সামনে আঙিনায় ছোট ছোট মিলিটারী তাঁবু–তাঁবুর আশেপাশে মিলিটারী অফিসার ঘোরাফিরা করছে। সবাই শিখ–লম্বা, ঢিলা পাজামা-কোর্তা, মাথায় ইয়া পাগড়ী।

ট্যাংকের পাড়ে তো মিলিটারী আর মিলিটারী। অদূর থেকে কৌতূহলী মানুষ দেখছে ভারতীয় সৈন্যসামন্ত নয়–দেখছে ভারতীয় সৈন্যের গাধা, কুকুর আর বানর। সত্যি, সেনাবাহিনীতে কুকুর বা বানরের অংশ গ্রহণ আমিও আর দেখিনি।

ট্যাংকের পাড়েই কে যেন বলে, গতকাল কলেজের পাশে এক গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে। কবর খুঁড়ে কিছু হাড়গোড় পাওয়া গেছে। আজ দাতিয়ারায় আরেকটি গণকবর খোঁড়া হবে।

রাস্তায় ফটিক ভাই–'পূর্বদেশে'র সিনিয়র সাব-এডিটর সামিউল আহমদ খান ফটিকের

সাথেদেখা।

ঃ দাতিয়ারা যাওয়ার দরকার নেই–দেখে এসেছি। এখন চলুন পৈরতলা। ফটিক ভাই বলেন–ফটোগ্রাফারও ঠিক করেছি; 'পূর্বদেশের' জন্য ছবি তুলবো। ওখানে দু'টি গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পৈরতলা-ই রওনা হলাম।

শুনলাম, দাতিয়ারা ওয়াপদা অফিসের পূর্ব দিকে আজাদদের পাশের বাড়ীতেই কবর খুঁড়ে কিছু কঙ্কাল পাওয়া গেছে। ওয়াপদা অফিসে তো আর্মিদের একটা ক্যাম্প ছিলো। ওখান থেকে রাতের বেলা অসহায় বন্দী বাঙ্গালীদের এনে এখানে–দাতিয়ারায় এ জায়গাটায় গুলী করে মারতো এবং শেষে ওখানেই মাটি চাপা দিয়ে দিতো।

পৈরতলা খাঁ বাড়ি পার হয়ে রেললাইন ধরে একটু পশ্চিমে যেতেই ছোট ব্রীজ। ব্রীজটার নিচে বহু লোক। ওটাই বধ্যভূমি।

কোদাল দিয়ে খানিক মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়লো মানুষের হাড়গোড়, কঙ্কাল। পাশাপাশি দু'টি ইয়া বড় গণকবর। কয়েক শ লাশ–কঙ্কাল। গাদাগাদি করে মাটি চাপা দিয়ে রাখা। নীচের দিকে কিছু মাংসল লাশও দেখা গেলো–ওই, ওই তো মাথায় টুপীও দেখা যাচ্ছে।

'পূর্বদেশে'র জন্য কিছু ছবি তোলা হলো।

ঃ গত ঈদের রাতে শ'খানেক মুক্তিকে জেলখানা থেকে এনে এখানে মারে।–দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন ফটিক ভাই–সেই রাতে আমরা বাড়ী থেকে গুলীর আওয়াজ শুনেছি।

বধ্যভূমির বাতাস কেঁদে কেঁদে বললোঃ এই সব মুক্তি-পাগল বাঙ্গালীরা অকাতরে প্রাণ দিয়েছিলো বলেই তো আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশ।

কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ সজল হয়ে উঠলো।

বায়াত্তুরের মার্চ মাস। কলেজ থেকে বেরিয়ে কোর্ট রোড দিয়ে চলেছি। হঠাৎ 'স্যার' ডাক শুনে দাঁড়াই। চোখ তুলে দেখি আমার সামনে কাছাইট গ্রামের আব্দুল মন্নান ভুইয়া, বি, এ।

ঃ স্যার, শুনলাম আপনি নাকি 'গণকবর'-এর সন্ধান করছেন?

আমি সংক্ষেপে বলি–জ্বি।

ঃ তা'হলে আমার কাহিনীটা শুনুন, স্যার। আপনি না লিখলে এ ইতিহাস কোনদিনই লেখা হবে না, স্যার। আবদুল মান্নান ভুঁইয়াকে নিয়ে পাশের একটা চা-দোকানেঢুকলাম।

ঃ ঠিক আছে–আপনি বলুন। আমি কাগজ-কলম হাতে নিয়ে বলি–ইতিহাস না হোক, ঘটনাটা টুকে রাখি। তা হলে এটাকে আর কেউ রটনা বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

ঃ এপ্রিলের ১৪/১৫ তারিখ হবে–ওই যেদিন প্রথম বিমানাক্রমন হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপর–সেদিন আমি বাড়ি থেকে শহরে আসছিলাম, আড়াইসিধা যাবো বলে। পথিমধ্যে হঠাৎ বিমানের হামলা। রাস্তার পাশে খালের মধ্যে শুয়ে পড়ি।

বিমান চলে যাওয়ার পর রাস্তায় নেমে দেখি শহর থেকে দলে দলে মানুষ পালাচ্ছে। শিমরাইলকান্দি পৌঁছে দেখলাম তিতাস-এর উপর নৌকা আর নৌকা। নৌকা বোঝাই বাঙ্গালী চলেছে পূব দিকে মানে আগরতলা।

এল, এস, ডি সার গুদাম পার হয়ে শিমরাইল কান্দি রেললাইনে উঠে ডানে চোখ যেতেই ভয়ে আতংকে আমি, স্যার, শিহরিত হয়ে উঠলাম। দেখি, মালগুদামের রেললাইন আর কাদিয়ান মসজিদের মাঝখানের খালটাতে শত-শত মরা, আধমরা মানুষ–নর-নারী, শিশু। মুমূর্ষু শিশু ও নারীর গোঙানী ও আর্ত চীৎকার পরিবেশটাকে ভয়াবহ করে তুলেছে।

আমার সহসা কি হলো বলতে পারবো না স্যার। আমি স্থান-কাল ও পাত্র ভুলে দৌড়ে গেলাম মরা মানুষের স্তূপে। কয়েকশ রক্তাক্ত পুরুষ, নারী মরে স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে খালে। দেখেই বোঝা গেলো, গুলী, বেয়নেট চার্জ বা ছোরা দিয়ে জখম করে হত্যা করা হয়েছে হতভাগ্যদের। শিশু ও আধমরা আহত নারী কণ্ঠের ' পানি–পানি ' আর্ত হাহাকারে আমি দিশাহারা হয়ে পড়লাম। দৌড়ে গেলাম নদীতে। এক হ্যাঁছকা টানে আমার শার্টটা খুলে পানিতে ভিজালাম। শার্ট ভিজিয়ে ভিজিয়ে পানি দিতে লাগলাম মুমূর্ষু আদম সন্তানের মুখে মুখে।

আশেপাশে কোন জনমনুষ্য নেই। মসজিদের পাশে একটি লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার তামাশা দেখছে। ওকে ডাকতেই কাছে এলো। বললাম–ভাই, শিশুগুলিকে বাঁচাতে হবে, আপনি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন।

লোকটি ছুটে গেলো এবং খানিক বাদেই এক টিন নাবিসকো বিস্কুট হাতে দৌড়ে এলো। আবার গিয়ে আনলো এক কলস পানি আর একটি গ্লাস। আপনাকে কি বলবো স্যার, আল্লার কুদরত বুঝে সাধ্য কার–তিন চার মাসের বাচ্চারাও সেদিন দিব্যি বিস্কুট খেয়ে ফেললো এবং খেয়ে খেয়ে বাঁচলো।

আড়াইসিধা যাওয়ার কথা ভুলে গেলাম। একটা নৌকা ভাড়া করে সত্তর–আশি জন শিশু ও নারীকে নিয়ে আমি ফিরে এলাম কাছাইট।

ঃ এত লোককে রাখলেন কোথা?

ঃ আমার বাড়ি, আমার ভাইয়ের বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনের ঘরে ঘরে ভাগ করে দিলাম শিশু ও নারীকে। আপনাকে কি বলবো স্যার, আমার ওয়াইফ তার বুকের দুধও খাইয়েছে কচি কচি শিশুকে।

ঃ ক'দিন ছিল ওরা আপনার বাড়ি?

ঃ ছিল প্রায় ১৬/১৭ দিন। আমি তো স্যার, এগারো দিন কিছুই খাইনি মানে খেতে পারি নি। এগারো দিনের মাথায় রাজিয়ার অনুরোধে–আবদারে প্রথম কিছু খাই।

ঃ রাজিয়া? রাজিয়া কে?

ঃ ও আপনাকে তো বলা হয়নি। এই হতভাগ্যরা ছিল–ভৈরব রেলকলোনীর অবাঙ্গালী মুসলমান। ওদেরকে প্রথমে কলোনী থেকে সরিয়ে ভৈরব বাজার এক দালানে কিছু দিন রাখে। তার পর সেখান থেকে মেঘনায় এক লঞ্চে। লঞ্চ থেকে আশুগঞ্জ এবং আশুগঞ্জ থেকে রেলগাড়ীতে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মালগুদামে। হ্যাঁ, রাজিয়া হলো টি, এন, এল সিদ্দিক সাবের মেয়ে–ভৈরব কলেজে তখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ে। আর মহিলাদের মাঝে একজন ছিলেন এস, টি, অফিসের আলাউদ্দিন সাবের 'ওয়াইফ'। আর দুটি ছেলে যে কি সুন্দর ছিল, কি বলবো স্যার, চার-পাঁচ বছরের বেহেশতের ফুল দুটি ছিল ডি, টি, এন, এল হাসান সাবের। আর আর

ছেলে-মেয়ে বা মহিলার নাম-ধাম মনে নেই, স্যার।

ঃ হুম–তারপর?

ঃ ষোল-সতেরো দিন আমাদের বাড়িতেই রাখি ওদের। বাচ্চাদের 'গু-মুত' কেবল আমার 'ওয়াইফ'ই নয়, আমিও সাফ করি, স্যার। পাকবাহিনী যখন এখানে–'ওয়াপদা ক্যাম্পে', ক্যাপটেন আকরামের কাছে সবাইকে সোপর্দ করে মনে শান্তি পাই, স্যার। আচ্ছা, মালগুদামের কাছে ওই 'গণ-কবরের' কথা লিখবেন না, স্যার?

আমি চুপ থেকে শুনলাম সব।

আমার কলম আজ বারে বারে থেমে যাচ্ছে। এ কথা লিখতে গিয়ে কলম বারে বারে হোঁচট খাচ্ছে–ক'টি মুমূর্ষু আদম সন্তানকে–'আশরাফুল মাখলুকাত'কে বাঁচানোর অপরাধে(?) কাছাইটের আব্দুল মান্নান ভুঁইয়াকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের বিচারে দেড় মাস হাজত বাস করতে হলো।

সাক্ষাৎকার

ঃ আচ্ছা, যে গল্পটা আপনার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিল, বললেন, ওটার নাম কি ছিল?

ঃ 'ভালোবাসি আলেয়ারে'।

ঃ সেটা কি কোন কাগজে ছাপা হয়েছিল?

ঃ হ্যাঁ, পূর্ব-পাকিস্তানের একটা নতুন মাসিকী 'নও-বাহারে ' তা কিছু দিন পর প্রকাশিত হয়েছিল।

ঃ তখন আপনার বয়স কত ছিল?

ঃ তখনকার বয়স? ধরুন আমার তিন বছুরে নাতির বিশগুন বয়স যদি এখন হয়ে থাকে আমার, তাহলে বিশ দু'গুণে চল্লিশ বছর আগে ঐ গল্পটা লেখার সময় হম, আমার বয়স বিশ একুশ ছিলো বলেই হিসাব পাচ্ছি।

ঃ চল্লিশ বছর আগের রচনা হয়ে থাকলে, তখন তো আপনার ছাত্র থাকার কথা।

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ–চৌধুরী সাব তার শুভ্র শ্মশ্রুর হাসির ফাঁক দিয়ে সাদা দাঁত বার করেন–আমি তখন বি, এ ক্লাসের ছাত্র।

ঃ আচ্ছা চৌধুরী সাব, কিছু মনে করবেন না, সাহিত্যকে তো বাস্তবের প্রতিচ্ছবি বলা হয়, তো আপনার ঐ আলোড়নকারী গল্পটার মাঝে সত্যি ঘটনা কতখানি?

ঃ সত্যি ঘটনা? মানে 'ভালোবাসি আলেয়ারে' সত্য ঘটনা নিয়ে লেখা গল্প কি না?

ঃ জ্বি জ্বি।

ঃ না–না, সত্য ঘটনা নিয়ে আমি তা' না লিখলেও গল্পটা সত্যি আমার জীবনে ঘটে।

ঃ তার মানে?

ঃ মানে–চৌধুরী সাবের ষাট বছরের অভিজ্ঞ মুখাবয়বটা ধীরে ধীরে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। কালো, মোটা শেলের ফ্রেমের বাই-ফোকাল চশমার আড়ালে চোখের দৃষ্টি হঠাৎ স্থির বিদ্যুতে দাঁড়ায়–মানে, আমি যা কল্পনা করেছিলাম, আমার জীবনেই তা, গল্প না হয়ে সত্যি-সত্যি বাস্তবে ঘটে গেল।

একটা দীঘল শ্বাস দীর্ঘক্ষণ বিরাজ করলো টেবিলের সামনে, 'পার্গালের চারি পাশে। আমরা ততক্ষণে কৌতূহলে প্রায় তেতে উঠেছি।

ঃ তা কী ভাবে? কল্পনা গল্প না হয়ে আপনার জীবনে তা সত্যি সত্যি ঘটলো কী ভাবে?

আমাদের উদগ্র আগ্রহ শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাঝে গিয়ে উৎকর্ণ হয়–সে গোগ্রাসে গেলার জন্য বুভুক্ষু চোখ তখন চৌধুরী সাবের চোখে মুখে।

সম্প্রতি বেসরকারী চাকুরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত, কথা সাহিত্যে একাডেমী পুরস্কার পাওয়া ষাট বছরের প্রবীণ সাহিত্যিক মোমেন চৌধুরী স্মৃতির সিঁড়ি ধরে-স্থির পদক্ষেপে ফেলে-আসা দিনের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমাদের আত্যন্তিক আগ্রহের দিকে চোখ তুলে চৌধুরী তাঁর মুখ

খুললেন। আমরা নির্বাক বিস্ময় নিয়ে মুগ্ধ নয়নে চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে আছি–আশ্চর্য, তাঁর বাই–ফোকাল গ্লাসটা দেখতে দেখতে আমাদের সামনেই ওয়ান এন্ড হাফ বাই ওয়ান টি–ভির মিনি পর্দা হয়ে উঠলো এবং আমরা অবাক হয়ে মোমেন চৌধুরীর কথা ও ছবি উপভোগ করতে লাগলাম।–

আমি তখন আই, এ ক্লাসের ছাত্র, বড় ভাই এম, এ শেষ বর্ষে। আমি বাসা থেকে ক্লাশ করি, ভাই থাকেন, মুসলিম হলে। একদিন 'যুগান্তর' 'ছোটদের পাত্ তাড়িতে' নতুন সদস্যদের নামের তালিকায় একটি নাম দেখে চমকে উঠি–আরে,মোমেনা হক! এটা আবার কে?

ঠিকানা দেখলাম, করিমগঞ্জে–সিলেট। মোমেনা হকের সখ–গল্প পড়া ও লেখা এবং পত্র মিতালী করা। আশ্চর্য মিল। আমার মতোই হুবহু।

আমিও 'পাত্তাড়ির' সভ্য। না-না, কেবল পাত্তাড়ির নয়–আজাদের 'মুকুলের মহফিলের' তো বটেই 'আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দমেলার'ও সদস্য তখন। বাংলাদেশের এখানে-ওখানে আমার বহু লেখনী বন্ধু। পত্র-মিতালী করা আমার দারুণ নেশা।

আমার নামের সাথে তার নামের মিল দেখে সেদিনই লিখে ফেললাম মোমেনা হককে। লেখনী বন্ধুর চিঠি।

আশ্চর্য তিনদিন পরই পেলাম মোমেনা হকের চিঠি। কি সুন্দর হস্তাক্ষর আর মিষ্টি চিঠির ভাষা। সিলেটের মেয়ে তা-ও আবার নবম শ্রেণীর ছাত্রী যে অমন বাংলাও লিখতে জানে তা ছিল আমার চিন্তার অতীত। তারপর থেকে চললো আমাদের চিঠি লেখার প্রতিযোগিতা-কে বেশী লিখতে পারে। আর লেখার জোরে ক'মাসেই আমি হয়ে গেলাম ওদের পরিবারের একজন। মোমেনার বড় বোন মিনু আপাকেও লিখি–মিনু আপা বি, এ পড়ে তখন।

পাকিস্তান আন্দোলন তখন একেবারে তুঙ্গে। ক্রিপস মিশনের রায় বেরিয়ে গেছে, আমরা পাকিস্তান পেয়ে যাচ্ছি। মুশকিল বাঁধলো সিলেট নিয়ে। অবশেষে ঠিক হলো সিলেট রেফারেন্ডাম হবে–গণভোটেই সাব্যস্থ হবে সিলেট পাকিস্তানে থাকবে না ইন্ডিয়ায়।

মোমেনা হক চিঠি লিখেছেঃ আমরা তোমাদর সাথে থাকবো, 'পাকিস্তান' চাই। সাজ সাজ রব। ৫ই জুলাই সিলেট গণভোট। ১লা জুলাই আমাদের কলেজ থেকে ছাত্রদল সিলেট রওনা হয়ে গেল। আমার বড় ভাই বিশ্ববিদ্যালয় দলে সুনামগঞ্জ চলে গেছেন বলে আব্বা আমাকে কিছুতেই যেতে দিলেন না। পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করার জন্য ছাত্রদের মাঝে তখন কি উত্তেজনা, কি উৎসাহ।

আমি ভাবছিলাম মোমেনা হকের কথা। রেফারেন্ডামের পর আমরা একই দেশে একাত্ম হয়ে থাকবো–আমাদের চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণা একই দেশের স্রোতে গলাগলি হয়ে চলবে। আমরা ভিন্ন জেলায় থাকলেও অভিন্ন হয়ে থাকবো, কি মজা।

ঃ নানা ভাই।–ফুটফুটে ছোট্ট একটি শিশু ঢুকে ঘরে–নানু বলেছে, চা খাবেন?

ঃ হ্যাঁ, নানা ভাই–চা খাবো।

ঃ ওমা আমি তো দীপ্তি, তুমি নানা ভাই!

চৌধুরী সাবের মুখে হাসির দীপ্তিঃ হ্যাঁ হ্যাঁ আমারই ভুল হয়েছে, তুমি হলে দীপ্তি–এবার যাও তো দীপ্তিমনি–তোমার নানুকে বলো চা দিতে।

প্রজাপতির মতোন ডানা মেলে চৌধুরী সাবের তিন বছুরে নাতনী হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

ঃ সিলেট রেফারেন্ডামের পর কী হলো?

ঃ আর রেফারেন্ডাম!–একটা দীর্ঘশ্বাস ষাট বছরের বুড়ো বুক থেকে হাহাকার করে বেরিয়ে এলো– করিমগঞ্জকে পাকিস্তানে আসতে দিলো না শয়তানরা।

হঠাৎ নীরবতা নেমে আসে ঘরটাতে। ধীরে ধীরে শব্দহীন, নিশ্ছিদ্র গভীরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি আমরা সবাই। চা পর্বের পর আমিই জানতে চাইঃ আপনার লেখনী বন্ধু মোমেনা হকের সাথে কি আপনার দেখা হয়েছিল?

ঃ দেখা?–বৃদ্ধ মোমেন চৌধুরী হঠাৎ চমকে উঠলেন। কিন্তু সাথে সাথেই নিজেকে সামলে নিয়ে দাড়ি-গোঁফের আড়ালে একটুখানি দুধ-হাসি ঝাড়লেনঃ হ্যাঁ,'দেখা'–আক্ষরিক অর্থে আমার একবার দেখা হয়েছিল বৈ কি! কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আগের কথাই আগে বলুন।

আরাম কেদারায় কায়দা করে বসলেন এবং চোখ বন্ধ করে মোমেন চৌধুরী তাঁর গল্পের মুখবন্ধ করলেনঃ আমি তখন সেকেন্ড ইয়ার অনার্স, মোমেনা হক চিঠিতে জানালো, 'বিনিময় করে' তার পরিবারের সবাই পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসছে। খবরটা শুনেই আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম।

ঃ ভয়? বলেন কি, আপনার দীর্ঘ দিনের অদেখা লেখনী বন্ধুর সাথে দেখা হবে, এতো খুশীর কথা। আপনি ভয় পেলেন কেন?

মোমেন চৌধুরী তাঁর নির্মীলিত নেত্র বন্ধ রেখেই স্বগতোক্তি করতে লাগলেন। আমরা তাঁর চশমার কাঁচে 'টি-ভি' দেখতে থাকলাম।

তখন বয়সই বা কতো আর বুদ্ধি শুদ্ধিই কতো হবে। মোমেনার আব্বা রিটায়ার্ড ডি, সি, মানে আমাদের দেশের ডি, এম। সেই ডি, এম, এর মেয়ের সাথে অতোদিন যে ফাঁকি দিয়ে চলেছি, এবার তো তা ফাঁস হয়ে পড়বে। মোমেনার আত্মীয় স্বজনরা অনেকেই উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। তারা সবাই এখানে চলে এলে, আমাকে বের করতে মোমেনার কোনই বেগ পেতে হবে না। আর আমাদের বাড়ী এলেই সব শুমর ফাঁক হয়ে যাবে।

ঃ শুমর? শুমর আবার কি?

ঃ এ কথা মনে হতেই অজানা ভয়-ত্রাসে আমার বুক কেঁপে উঠলো।এবার উপায়?

সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে পর্যালোচনা করতে লাগলাম। মোমেনা হকের কাছে আমি 'মনু' নামে পরিচিত। এটাই আমার ডাক নাম। এ নামে আমার কটি কবিতাও তখন মহিলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নামটা আমাদের দেশে ছেলেমেয়ে উভয়েই ব্যবহার করে থাকে। তা ছাড়া আমার হাতের লেখাটা গোট-গোট অক্ষরের হয় বলে অনেকেই মেয়ের হস্তাক্ষর মনে করে থাকে। মাসিক মহিলা পত্রিকার সম্পাদিকা তো মনুকে মানে

আমাকে মেয়েই মনে করেন।

হ্যাঁ মোমেনা হকও জানে আমি মেয়ে। এবং আমিও কোন দিন ওদের বুঝতে দিই নি যে আমি ব্যাটা ছেলে। আমি চাই লেখনী বন্ধু সে ছেলে কি মেয়ে এ নিয়ে তো অতো দিন মাথা ঘামাইনি।

কিন্তু এবার মাথা ঘামানো নয়, চোখের সামনে জ্বলজ্যান্ত দেখতে পেলাম, পুলিশ এসে আমাদের ঘরের কড়া নাড়ছে। কে? বলে আব্বা বেরুতেই পুলিশ বললো–এ বাড়ীতে কি মনু বলে কেউ আছে? আব্বা আমাকে ডেকে আনলেনঃ এই মনু।

পুলিশ সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাকে অবলোকন করে শেষে বললোঃ আপনাকে এখন এস্‌পির বাসায় যেতে হবে।

ঃ আমাকে? কেন?

ঃ কেন জানি না করিমগঞ্জ থেকে ওনার শ্বশুর–শাশুরি সবাই এসেছেন–

ঃ না না আমি যাবো না–অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি বাসার ভেতর দৌড়ে পালালাম। পেছন থেকে পুলিশ চেচাঁচ্ছেঃ আরে যাবেন না–শুনুন। পুলিশের হাত থেকে তো পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না আসুন, শুনুন।।

আমি আর ফিরলাম না।

এই অত্যাসন্ন অবশ্যম্ভাবী বিপদ ও অপমানের হাত থেকে বাঁচার চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। রাত-দিন শুধু ওই একই চিন্তার জাবর কাটাঃ মোমেনা হকরা এসে যদি আমার খোঁজ করে?

অবশেষে উপায় একটা পেয়ে গেলাম। তখন মনে হলো, আরে এ তো অতি সহজ পথ। অথচ সহজ কথাটাই সহজে আমার মনে আসছিল না।

মোমেনা হকের সব চিঠি একটা প্যাকেটে পুরে রেজিষ্টার্ড পার্শেল করে করিমগঞ্জের ঠিকানায় পাঠালাম। সাথে আমি মোমেন চৌধুরী বাঁকা হস্তাক্ষরে মুরুব্বী ষ্টাইলে মোমেনাকে লিখলামঃ আমি তোমার লেখনী বন্ধু মনুর বড় ভাই। মনুর অন্তিম নির্দেশ ক্রমে মনুর কাছে লেখা তোমার সমস্ত চিঠিপত্র পাঠাচ্ছি। তোমার জগতে মনু আর বেঁচে নেই।

আশ্চর্য, সপ্তাহ না ঘুরতেই মোমেনা হকের চিঠি এলো। কেবল জবাব নয়, তিন বছর ধরে লেখা আমার সব চিঠি সে রেজিঃ পার্শেলে ফেরত পাঠিয়েছে। আর আমাকে মানে মোমেন চৌধুরীকে এই প্রথম চিঠি লিখলোঃ ভাইজান, সংসার জায়গাটা বড়ই বিচিত্রস্থান। আর এখানকার মানুষ নামধারী জীবগুলি আরো বিচিত্র, আরো অদ্ভুত। বেশীর ভাগ মানুষই সংসারের সারটুকু বাদ দিয়ে শুধু সঙ নিয়ে মেতে থাকে বলেই সংসারের এই দুরবস্থা। এই অদ্ভুত লীলাময় জগত থেকে মুক্তি পেলে আমিও বাঁচি। মনু যেখানেই থাকুক সুখে থাকুক এই কামনা করি। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ, দয়া করে আমায় লিখে আর বিরক্ত করবেন না।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মোমেনা হকের অন্তিম চিঠি পড়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। 'আমায় লিখে আর বিরক্ত করবেন না' এ কথার মানে কী? তা'হলে মোমেনা হক কি বুঝতে

পেরেছে মনু আর মোমেন চৌধুরী একই ব্যক্তি?

ঃ সে জবাব কি আপনি পেয়েছেন?

ঃ না, সে জবাব পাই নি। আর না পাওয়ার বেদনাতেই লেখা সম্ভব হলো আমার মাস্টার পীস–'ভালোবাসি আলেয়ারে'। গভীর শ্বাস ছেড়ে থামলেন মোমেন চৌধুরী।

সহসা নীরবতা নেমে এলো আমাদের টেবিলে, মোমেন চৌধুরীর ইজি-চেয়ারে আর ঘরের চারিপাশে।

ঃ সত্যটা কিভাবে গল্প হয়েছে বুঝলাম, স্যার। আমিই ঘরের নীরবতা ভাঙ্গি কিন্তু গল্পটা যে কেমন করে সত্য হলো, তা তো বুঝলাম না, স্যার।

একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে চৌধুরী সাব বললেনঃ সংসারে সবই ঘটে হে–সব কিছুই ঘটে। আমাদের দেখার চোখ নেই বলে দেখি না, বোঝার মন নেই বলে সব সময় বুঝি না।

ঃ কেমন করে?

ঃ আমি তখন বরিশালে। একটা বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনা করি। আমার সহধর্মিনী মেয়েদের স্কুলের মাস্টারনী। আমাদের প্রথম সন্তানের বয়স মাত্র এক বছর।

সেদিন অকাল বৃষ্টির জন্য কলেজে আটকে গেছি। ষ্টাফরুমে বসে বাসী কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, একটা খবরে চমকে উঠিঃ সাহিত্যিকের শাদী মোবারক। প্রখ্যাত কথাশিল্পী জামিল হোসেন গত ১লা এপ্রিল করিমগঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত ডি. সি. মাসুদুল হকের তৃতীয় কন্যা মোমেনা হককে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ করেন।

আমি কেন জানি না, হঠাৎ বোবা হয়ে গেলাম। আমার হৃদ স্পন্দন দ্রুততর হতে লাগলো। সেই বৃষ্টি-ঝরা বাদল দিনে প্রায়ান্ধকার ষ্টাফরুমের নিভৃত কক্ষে আমর হৃদয়ে বেজে উঠলো চিরবিরহিনীর গভীর গোঙানীঃ এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বাদল বরিষায়–

বাসায় ফিরে আমার সহধর্মিনীকে এ সুসংবাদটুকু জানাতেই তিনি বলে উঠলেন–যাক মেয়েটার যে শেষ পর্যন্ত একজন সাহিত্যিকের সাথে বিয়ে হয়েছে, এ দেখে আশ্বস্ত হলাম, খুশী হলাম।

হ্যাঁ, জামিল হোসেনকে চিনতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সমসাময়িক ছিল। ছাত্র হিসাবে ফার্স্টক্লাশ পেয়ে যেমন নাম করেছিল, গল্প লেখক হিসাবেও পরিচিত ছিল সব মহলে। এ দু'গুণের জোরেই এস, এম, হলের জি, এস নির্বাচিত হয়েছিল সেবার। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর জীবিকার তাগিদে কে কোথায় ছিটকে পড়েছি। জামিল হোসেন বিয়ের সময় কোথায় কি করতো কিছুই জানতাম না। জানলাম বিয়ের সাত বছর পর করাচী গিয়ে। বড় ভাইয়ের অসুখের কথা শুনে 'উড়ে' যাই করাচী। ভাই ষ্টেট ব্যাংকের রিসার্চ অফিসার। চিকিৎসা ব্যাপারে আমাকে থাকতে হয় মাস খানেক।

নজরুল একাডেমীতে ক'জন বাঙ্গালী কবি-সাহিত্যিকের সাথে পরিচয় হলো। 'সূর্য দীঘল বাড়ী'র আবু ইসহাক, আনিস চৌধুরী, শামসুজ্জামান। সেখানেই একদিন জামিল হোসেনের মাথে আলাপ পরিচয়।

ঃ মিষ্টার জামিল হোসেন–আন্ডার সেক্রেটারী, থাকেন জাহাঙ্গীর রোড ইষ্ট। আর ইনি হলেন গল্পকার মোমেন চৌধুরী এসেছেন বেড়াতে।

ঃ আসুন না একদিন বাসায়–প্রথম আলাপেই জামিল হোসেন আমাকে আমন্ত্রন জানায়–আপনাকে দেখতে পেলে আমার ওয়াইফও খুশি হবে।

ঃ আপনার ওয়াইফ? সব বুঝেও আমি না বুঝার ভান করি–আপনার ওয়াইফ আমাকে চেনেন নাকি?

জামিল হোসেন হাসতে হাসতে বলেন–ওমা, মোমেনা হক কে মনে নেই? ওই যে করিমগঞ্জের– আপনার লেখনী বন্ধু। ওর মুখেই শুনেছি আপনার সব কথা। নির্মল হাসি জামিল হোসেনের চোখে মুখে।

সময় করতে পারলে যাবো একদিন এমনি ধরনের একটা কথা দিলেও সত্যই কি আমি ওয়াদা রক্ষা করেছিলাম?

অনেক–অনেক দিন পর মোমেনা হকের কথা মনে পড়লো। কিন্তু বাংলা মায়ের কোল থেকে বহু দূর সুদূর আরব সাগর তীরে করাচীর অচেনা, অজানা স্থানে মোমেনা হকের বাসায় যাওয়াটা কি শোভন হবে? জামিল হোসেন যদি মনে করেন যে তার স্ত্রীকে দেখার লোভেই তার বাসায় হাজির হয়েছি। তাছাড়া যে আমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে আমার লেখা সমস্ত চিঠিপত্র ফেরত দিয়ে ফেলেছে এক যুগ আগেই তার কাছে যাই কোন লজ্জায়? এসব সাত পাঁচ ভেবে জামিল হোসেনের বাসায় আর যাই না।

কিন্তু বাড়ি ফেরার দিন যতোই ঘনিয়ে আসতে লাগলো জাহাংগীর রোডে মোমেনা হককে এক নজর দেখার আকর্ষণ আমার ততোই দুর্দমনীয় হতে লাগলো। শুধুই দেখা। যাকে কল্পনা করে একদা তারুণ্যের সবটুকু আবেগ আর উচ্ছ্বাস দিয়ে চিঠির পর চিঠি লিখতাম সেই মোমেনা হককে একবার শুধুই এক নজর দেখে চলে আসবো। আর কিছু নয়। এমন কি নিজের পরিচয়টাও দেবো না।

অবশেষে অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার চিরন্তন বাসনা ও কৌতূহলের দুর্বার স্রোত একদিন সত্যি আমায় ভাসিয়ে নিলো। যখন ডাংগার নাগাল পেলাম, দেখি জাহাংগীর রোড–ইষ্ট, জামিল হোসেনের বাসা।

তখন সকাল এগারোটা। জানতাম এ সময় জামিল হোসেন বাসায় থাকবেনা। তবু বাসার ভিতর কান পাতি। শিশুর কান্না আর স্নেহময়ী মা'র আদুরে গলা শোনা গেল – না না, সোনামনি কাঁদে না, না না –

আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বের বারান্দায় কতক্ষণ পায়চারি করি। এ অসময়ে অপরিচিত বাসায় কড়া নাড়া কি ঠিক হবে? দরজা যদি না খোলে। শুনেছি, এ সময়ে, বাড়ীর পুরুষ মানুষ যখন অফিসে, তখন অনেক বাসা থেকেই নাকি প্রতারকরা চুরি রাহাজানি করছে।

তা'হলে কি ফিরে যাবো?

জামিল হোসেনের বাসার বারান্দায় পায়চারী করছি আর ভাবছি, এখন কি করা যায়। এতোদূর এসে কি ফিরে যাবো? এমন সময় আমার কানে বেজে উঠলো গানের একটি সুন্দর

কলিঃ মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে– যেতে যেতে দুয়ার হতে কি ভেবে ফিরালে মুখখানি–

আর কোন সংকোচ নয়, আমি ঘরের কড়া নাড়া দিলাম– কড়–কড়–কড়াত...

ঃ কে?– বামা কণ্ঠের নীরস উচ্চারণ আমার মোটেই মনঃপুত হল না।

ঃ এটা কি জামিল হোসেনের বাসা?

ঃ জ্বি। ঘরের ভিতর থেকে এবার মিষ্টি সুর।– কিন্তু তিনি তো বাসায় নেই।

ঃ ও্ হ তাই নাকি!

এখন কি করা যায়? তিনি তো দরজাও খুলছেন না। জানালাও না। আমার অতো সাধের স্বপ্ন এমনি নিষ্ঠুর ভাবে গুঁড়িয়ে যাবে তা' তো ভাবি নি। মরিয়া হয়ে শেষে বলেই ফেলি ঃ মিসেস জামিল হোসেন কি আছেন?

ঃ জ্বি। আমি মিসেস জামিল হোসেনই বলছি।– না–না সোনামণি কাঁদে না–

ঃ তা'লে শুনুন– আমি নিমেষে কথা বানিয়ে ফেললাম– আমি সকালে ঢাকা থেকে এসেছি–

তবুও মিসেস জামিল হোসেন দরজা বা জানালা খুললেন না। বরং ভিতর থেকে তাগিদ দেন– হ্যাঁ বলুন, ঢাকা থেকে এসেছেন তারপর?

ঃ জামিল হোসেনকে বলবেন, ঢাকা থেকে তার বন্ধু কাইয়ুম চৌধুরী এসেছিল– নিজের পরিচয় গোপন করে ঝটপট বারান্দা থেকে নেমে পড়ি।

জাহাঙ্গীর রোড থেকে অপমানিত হয়ে ফিরলাম। বিদেশে একজন বাঙ্গালী মহিলা স্বদেশীর সাথে অমন নির্মম ব্যবহার করতে পারে? কোথায় মনে মনে ভেবেছি, বাঙ্গালীর পরিচয় পেয়েই 'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ' গোছের একটি সহৃদয় সুকণ্ঠ শুনবো, আর সেখানে কিনা– এই অপমানবোধ প্রতিহিংসার কাঁটা হয়ে এমনিভাবে আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করে যে, মোমেনা হকের সব স্মৃতি এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। মোমেনা হকের কোন রকম দাগ-চিহ্ন আমার মনে আর রইলো না।

দেশে আমার কর্মস্থলে ফিরে আমার নিজস্ব ভুবনে ডুবে গেলাম। আমার কলেজ, আমার দারা পুত্র পরিবার আর মাঝে মধ্যে কিছু সাহিত্যকর্ম–এ নিয়ে আমার বৈচিত্র্যহীন সাধারণ জীবন তার নির্দিষ্ট পরিক্রমায় গড়-গড় চলতে থাকে।

মাগরেবের নামাজ শেষ করেছি, এস, ডি, ই, ও খবর দিলেন, ঢাকা থেকে এ, ডি, পি, আই এসেছেন– ডাক বাংলোয় আছেন রাতেই যেন একবার দেখা করি।

বেসরকারী স্কুল-কলেজের জরিপ-রিপোর্ট নিয়ে তখন সারা দেশেই একটা আন্দোলন চলছে– সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সরকারী পরিদর্শকদল পাঠানো হচ্ছে। আমরা আগে থেকেই জানতাম, তাই কলেজের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, বিভিন্ন ষ্টেটম্যান সব তৈরী করে প্রস্তুত হয়ে আছি।

ডাক বাংলোয় গিয়ে দেখি, শহরের হেড মাস্টার মিস্ট্রেস সবাই হাজির। তাদের মুখেই শুনলাম, এ, ডি, পি, আই এম, হোসেন আগামী কাল আমাদের কলেজ ও স্কুলগুলি পরিদর্শন

করবেন।

রুমে ঢুকেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম ঃ ওমা এ, ডি, পি, আই যে মহিলা। গৌরবর্ণের গোলগাল মুখের টিকালো নাকে সোনালী ফ্রেমের চশমা। বুটিদার ঢাকাই শাড়ীতে মোড়া অভিজাত ও সুন্দর মুখশ্রী।

এস, ডি, ই, ও পরিচয় করিয়ে দিলেনঃ ইনি আমাদের আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল।

চেয়ারে বসতে গেছি, পাশের চেয়ার থেকে হেড মিস্ট্রেট বলে উঠলেনঃ আমাদের প্রিন্সিপাল সাবের আরো একটা পরিচয় আছে, আপা, ইনি একজন সাহিত্যিকও।

এ, ডি, পি, আই হাসিমুখে আমার দিকে তাকালেন ঃ ও, আচ্ছা বেশ- বেশ।

ও-পাশ থেকে হেড মাস্টার সাহেব বলে উঠেন ঃ সাহিত্যের জন্য আমাদের প্রিন্সিপাল সাব তো একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন।

ঃ হ্যাঁ, তাই নাকি?- এ, ডি, পি, আই এর মুখে শিশুর হাসি, আপনার পাবলিকেশন কেমন আছে?

ঃ পাবলিকেশন? আমি মুখ খুলি- আমাদের দেশে তো আর সহৃদয় পাবলিশার পাওয়া যায় না, নিজেই কষ্টে সৃষ্টে চার পাঁচটা গল্প সংকলন করেছি।

ঃ বহু দিন-ফিফ্‌টি এইট থেকে সেভেন্টি থ্রি-হুম্ এ পনেরো বছর তো রইলাম করাচী, এখানকার সাহিত্যকর্মের সাথে তেমন যোগাযোগ রাখতে পারিনি।- এ, ডি, পি, আই, নিজের থেকেই সাফাই গান-তা' প্রিন্সিপাল সাবের নামটা জানি কি?

আমি বিনয়ের সাথে আমার নামটা বলতেই এ, ডি, পি, আই, আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রায় যেন আঁতকে উঠলেন ঃ এ্যাঁ! আপনি মোমেন চৌধুরী।

আমি এ, ডি, পি, আই, এর বিস্মিত চোখে মুখে তাকিয়ে দেখি, স্থান কাল পাত্র সব ভুলে তিনি নিস্পলক নেত্রে আমাকে দেখছেন।

মুহূর্ত মাত্র। আমি চোখ নত করলাম

ঃ আপনি এ কলেজে কতদিন? নিজেকে সামলে নিয়ে এ, ডি, পি, আই, স্বাভাবিক হতে চেষ্টাকরেন।

ঃ সে তো পনেরো-ষোল বছর হয়ে গেলো-

ঃ ও, আপনি তা হলে ফাউণ্ডার প্রিন্সিপাল?

ঃ জ্বি।- জবাব দিয়ে আমি আবার চোখ নত করি।

এ, ডি, পি, আই নীরব হয়ে আছেন। দেখতে দেখতে রুমের সবাই নীরব। অতোগুলো জীবন্ত মানুষ নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ডাক বাংলোর দুই নম্বর কক্ষটা নীরবতার নিঃসীম সমুদ্রে তলিয়ে গেলো।

পরদিন সকাল থেকে আমরা কলেজে অপেক্ষা করছি। কলেজ পরিদর্শনে আসছেন এ, ডি, পি, আই এম, হোসেন। কলেজটিকে সাফসুত করে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করা হয়েছে। পিওন-দপ্তরী কেরানী-অধ্যাপক সবাই ব্যস্ত-সমস্ত, সন্ত্রস্ত।

দশটা-এগারটা পার হয়ে বারোটাও যায় যায়, এ, ডি, পি, আই আর আসেন না। শহরের স্কুল ক'টি দেখতে অতো সময়ই লাগে? আমরা প্রতীক্ষায় থেকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এমন সময় এলো ডাকবাংলোর পিয়ন।

ঃ আপনার চিঠি স্যার। এ, ডি, পি, আই সাহেবা দিয়ে গেছেন।

চিঠি হাতে নিয়ে বিস্ময়ে মূর্ছা যাবার উপক্রম। লেফাফার উপর সেই বহু, বহুদিন আগেকার অতি চেনা, অতি প্রিয় হস্তাক্ষরে আমার নাম লেখা–মোমেন চৌধুরী মনু।

দ্রুত হৃদস্পন্দনের মাঝে উত্তেজিত কম্পিত হস্তে আমি চিঠি খুলি। চিঠি পড়ে তো আরো অবাক। একি পড়ছি আমি– নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। এ ও কি সম্ভব? আবার পড়ি। আবার ঃ কলেজ পরিদর্শন করতে এসে অধ্যক্ষ সাহেবের মাঝে লেখক মোমেন চৌধুরী এবং মোমেন চৌধুরীর মাঝে আমার সেই ফেলে আসা রঙিন দিনের মনুকে দেখতে পেয়ে আজ আমি কিছুতেই আপনার কলেজ পরিদর্শনে আসতে পারলাম না। করাচীতে আমার বাসায় কাইয়ুম চৌধুরীর ছদ্মাবরণে মোমেন চৌধুরীর সাথে দেখা না করে যে বেআদপী করেছিলাম তার জন্য আজ আপনার কাছে মাফ চাইছি। আপনি হয়তো জানেন না, আপনি যখন আমার বাসায় যান তার আগের দিন থেকে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী আমাদের বাসায় মেহমান হয়ে অবস্থান করছিলেন। যা হোক, সেদিন আপনার সাথে সাক্ষাত না করাটা আমার সত্যি অন্যায় হয়েছিল। অতীতের কথা মনে করে আমায় ক্ষমা করবেন। আপনি সাহিত্যিক মানুষ, সবই জানেন, সবই বুঝেন, তবু বলি– দিনের আলোয় হারায় কি রাতের তারারা? ইতি মোমেনা হক।

চৌধুরী সাব এটুকু বলেই থামলেন। একেবারে ডেড্ স্টপ। ষাট বছরের বৃদ্ধ, প্রবীণ সাহিত্যিক অধ্যক্ষ মোমেন চৌধুরী তাঁর দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুর আড়াল থেকে সাদা হাসির সুন্দর দন্তরাজি বের করে বলেন ঃ তারপর? তার আর কোন পর নেই–

'বিনিময়' ঃ জানুয়ারি ১৯৮৩

একজন অবিদিত মুক্তিযোদ্ধা

একাত্তরেররক্ত-ঝরার দিনগুলি। ষোলই আগস্ট। একটা বিশেষ দিন। আমি তখন বার্মা ইষ্টার্ণ লিমিটেড (বি-ই) এর জুনিয়র এক্‌জিকিউটিভ অফিসার। খুলনার দৌলতপুরে ডিপো সুপারইনটেনডেন্ট হিসাবে কাজ করছি। অফিস সংলগ্ন কোম্পানীর বাসা। সপরিবারে বসবাস। অফিসে বসে কাজ করছি। এমন সময়, বেলা দশটার দিকে, তিনজন মিলিটারী অফিসার আমার সামনে এসে উপস্থিত। পাক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার। মেজর বানোরী, মেজর ওয়ালেদ হোসেন শাহ ও ক্যাপ্টেন মালিক।

তারা আমায় ইংরেজীতে বল্লে 'জুট ব্যাচিং ওয়েল' বিতরণ সম্পর্কে কিছু আলোচনার জন্য আমাকে তাদের সাথে খুলনা সার্কিট হাউজে যেতে হবে।

সরল বিশ্বাসে আমি মিলিটারীর ফাঁদে পা দিলাম। মিলিটারীর গাড়ীতেই সার্কিট হাউজে গেলাম। ওখানে চার-পাঁচ ঘন্টা বসিয়ে রাখার পর যখন জানালো যে বিশেষ কাজে আমাকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে যেতে হবে, তখন আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। আমি সশঙ্কচিত্তে বুঝলাম, আমাকে ওরা গ্রেফতার করেছে– এবার আমার নিশ্চিত মৃত্যু।

আমার অজান্তেই ভীত-বিহ্বল স্থির চোখে ভেসে উঠলো আমার চার-চারটি অসহায় কন্যা সন্তানের পাশে ততোধিক অসহায় আমার বিধবা স্ত্রীর বিষন্ন মুখচ্ছবি।

আসন্ন বিপদ জেনেও আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম–আমাকে যশোর যেতে হবে কেন?

ঃ তেমন কোন গুরুতর অপরাধ করে থাকলে তোমাকে এখানেই গুলী করে মারা হতো– একজন মেজর জবাব দিলেন– যশোর ক্যান্টনমেন্টে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ভয়ের কোন কারণ নেই।

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে আমি হঠাৎ বোবা হয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে আর কোন রা-ই বেরুলো না। ধীরে ধীরে ওদের গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। আমাকে নিয়ে মিলিটারী গাড়ী ছুটলো খুলনা থেকে যশোর উদ্দেশ্যে। দ্রুত, অতি দ্রুত বেগে। গাড়ী চালনার অস্বাভাবিক গতি দেখে আমার প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিলো, গুলী নয়, এই গাড়ী দুর্ঘটনাই হয়তো আমার মৃত্যু ঘটাবে।

আশ্চর্য–সত্যি সত্যি মিলিটারী গাড়ীটা দুর্ঘটনায় পড়লো। আমাদের সবাইকে নিয়ে গাড়ী রাস্তার পাশে পানি ভরা এক খাদে গিয়ে পড়লো। আর আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, এমন দুর্ঘটনাতেও আমি মারা গেলাম না। অলৌকিকভাবে আমরা সবাই বেঁচে গেলাম।

যশোর ক্যান্টনমেন্টে, ওই ১৭ই আগস্ট থেকে ২৩শে আগষ্ট, এই সাত দিন জিজ্ঞাসাবাদের অজুহাতে আমার উপর দিয়ে যে অমানুষিক দুর্বিষহ নির্যাতন চালান হয়, তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। তোমরা জান, আল্লাহ্ পাক কোরান শরীফে বলেছেন, দুনিয়ার সমস্ত সাগর-নদী যদি কালি হয় আর পৃথিবীর সমস্ত গাছপালা হয় কলম– তা'হলেও সেই কলম দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার গুণের প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না। আমার এখন মনে হচ্ছে, পৃথিবীর তাবত ভাষা একত্র করলেও পাক জল্লাদ বাহিনীর নির্যাতন, অত্যাচারের কাহিনী লিখে শেষ করা যাবে না। ওদের নির্যাতন? কিল, ঘুষি, অকথ্য গালি ও বুটের লাথি খাওয়া সে

তো ছিল সাধারণ, মামুলি খাওয়া। আর ওদের গালি ছিল, গান্দার কী বাচ্চা, শুয়োর কা বাচ্চা, ইন্দুকা বাচ্চা, বাষ্টার্ড ইত্যাদি। দৈহিক নির্যাতনের মাঝে অতি সাধারণ ছিল বেত মারা। এই বেত মারা যে কী চীজ তোমরা অনুমানও করতে পারবে না। কঞ্চি, লাঠি, ভাংগা চেয়ার টেবিলের পা থেকে শুরু করে লোহার রড পর্যন্ত ছিল বেতের নমুনা। আর এই বেত মারা হতো জুতা খুলে পায়ের তলায়, পাছায়, পিঠে, বুকে, মাথায়– যখন যেখানে খুশি। তবে পায়ের তলায় বেত মারা, আর দু'হাতের আঙ্গুলে একত্র করে আড়াআড়িভাবে একটার ফাঁকে আরেকটা ঢুকিয়ে যখন জোরে শালারা চাপ দিতো তখন যন্ত্রণার চোটে মনে হতো এই বুঝি জানটা বেরিয়ে গেলো!

জল্লাদবাহিনী প্রতিদিন নতুন নতুন প্রশ্ন করতো আর নব নব পন্থায় নিদারুণ নির্যাতন চালাতো। জল্লাদ বাহিনীর প্রশ্নগুলি হতো যেমন আজগুবী, নির্যাতনের নমুনাও হতো তেমনি অভাবিতপূর্ব ও অমানুষিক। ওরা আমাকে মোটামুটি এ ক'টি প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে অভিযোগ আনে–

(১) তুমি একজন পাকিস্তান বিরোধী এবং বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থক;

(২) তুমি অসহযোগ আন্দোলনের সময় যশোর ক্যান্টনমেন্টে পেট্রোল জাতীয় তৈল সরবরাহে বিরত থাক এবং পরবর্তীকালে অবস্থা যখন মিলিটারীর আয়ত্তে আসে, তখন তুমি রংপুর ও বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে তেল সরবরাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি কর;

(৩) তুমি একজন আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং মুক্তিফৌজের সাহায্যকারী। ১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ রাত আটটায় তোমার গাড়ী কয়েকজন মহিলা আরোহী নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাই শেখ নাসিরের বাড়ী যায়;

(৪) ঢাকাস্থ টেলিফোন বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট ডাইরেক্টর শেখ ফয়জুল্লার সাথে তোমার অহরহ টেলিফোন যোগাযোগ হতো এবং তোমরা পরস্পর মুক্তিফৌজের খবর বিনিময় করতে। তার মধ্যে একটা বিশেষ খবর ছিল এ রকম– 'চার জাহাজ পাক সৈন্য ঢাকা থেকে খুলনার পথে রওনা হয়েছে, মুক্তিফৌজকে সংবাদটা জানাও;

(৫) তুমি শেখ ফয়জুল্লাহ মারফত মুক্তিফৌজকে অর্থ সরবরাহ করতে। এই উদ্দেশ্যে তুমি তার কাছে টিএমও করেছো,

(৬) তুমি খালিশপুর অঞ্চলে অবাঙালী হত্যায় সক্রিয় সহযোগিতা করেছো;

(৭) তুমি ২৮শে মার্চ জাহাজযোগে গাজীরহাট চলে যাও এবং সেখানে আবদুল বারী মোল্লা ও তার ছেলে আবদুল হামিদ মোল্লার সহায়তায় মুক্তিফৌজ গঠন করার চেষ্টা কর।

এসব প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ ও অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন করতো পাকবাহিনীর এফ, আই, ইউ (F, I, U) এফ, আই, টি (F, I, T), আই এস আই (ISI) ইত্যাদি টীম। আর এদের মধ্যে পদস্থ কর্মচারী ছিল মেজর ওয়ালেদ হোসেন শাহ, মেজর আকরাম, মেজর খোরশেদ ওমর ও নাম না জানা আরো ক'জন জল্লাদ।

প্রতিদিন ওরা নতুন প্রশ্ন করে আমার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্য নতুন নতুন পন্থায় নির্যাতন চালাতো। কোন দিন হাতের উপর ভর দিয়ে, পা উপরের দেয়ালে ঠেকিয়ে মাথা নীচু করে থাকতে হতো ঘন্টার পর ঘন্টা। পড়ে গেলে বা ওভাবে থাকতে না পারলে খেতে

হতো নির্দয় মার ও নিষ্ঠুর লাথি। কোনদিন বা পা দু'টি ছাদের বৈদ্যুতিক পাখার সাথে বেঁধে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে চালিয়ে দিত পাখা ফুলস্পীডে। কতক্ষণ পরেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়তাম। অজ্ঞান হয়ে গেলেই বৈদ্যুতিক পাখা থেকে নামিয়ে আমায় ফেলে রাখতো মেঝের উপর। তাছাড়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 'ফেটিক'—মানে, কবর খোঁড়া, ঘাস উপড়ানো, মোট বওয়া, জঙ্গল সাফ করা এসব তো করতেই হতো।

এর মাঝেই দেখতাম প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের মাঝখান থেকে ২০/২৫ জন করে লোককে চোখ বেঁধে নিয়ে যেতে। ওসব হতভাগা লোককে আর কোন দিন ফিরে আসতে দেখিনি।

নরপিশাচদের নির্যাতনের কথা যেন বলে শেষ করার নয়। ওরা আমাকে মাঝে মাঝে চায়ের সাথে ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিত। তারপর আমাকে বাধ্য করতো পাঁচশ পাওয়ার বালবের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে। দু'পা ফাঁক করে দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে তীব্র শক্তিসম্পন্ন আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। ঘুমের অষুধের প্রতিক্রিয়ায় চোখে ঘুম এলেই জল্লাদরা আমায় নির্মমভাবে প্রহার করে সজাগ রাখতো। এভাবে কতক্ষণ থাকার পরই আমি চারিদিক অন্ধকার দেখতে থাকতাম এবং এক সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেই পশুরা শুরু করতো দৈহিক নির্যাতন। তারপর এক সময় আমি অসাড়, নিঃসাড় অজ্ঞান হয়ে পড়তাম—নির্যাতনেরব্যথা-বেদনা কিছুই আর অনুভব করতাম না।

তবে একবার গুলীর বাক্স বইয়ে নিবার সময় পা পিছলে পড়ে গেলে এক ক্যাপটেন এমন জোরে আমার কোমরে সবুট লাথি মারে যে, এখনো সটান হয়ে দাঁড়ালে কোমরে ব্যথা অনুভব করি— অমাবস্যা পূর্ণিমাতে দারুণ বেদনায় ভুগি।

এহেন নির্যাতন করে এবং অনেকবার গুলীর ভয় দেখিয়েও যখন আমার কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তিই আদায় করতে পারলো না, তখন পাক জল্লাদ বাহিনী আমাকে যশোর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিল।

জেলখানায় অনেক বন্দীর মাঝে পরিচয় হয় ম্যাজিস্ট্রেট চৌধুরী সানওয়ার আলী ও অধ্যাপক মোহাম্মদ শরীফ হোসেন এর সাথে। চৌধুরী সাব তখন প্রায়ই বলতেন— দেশ যদি স্বাধীন হয়, আর আমি মুক্তি পাই, তাহলে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এস, ডি, ও হবো।

জেলে যাওয়ার পরও কয়েকবার মিলিটারী অফিসার নানা ধরনের ফরম নিয়ে আমাদের কাছে আসে এবং নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করে কী সব যেন লিখে নেয়।

৬ই ডিসেম্বর, '৭১ সন্ধ্যা ৬ টায় আমাদের গুলী করে হত্যা করার আদেশ হয়। আল্লার অশেষ রহমত, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, ঐদিনই বিকাল চারটায় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যশোর শহর অধিকার করায় আমরা অলৌকিকভাবে বেঁচে যাই।

আজ স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত আকাশের নীচে যখন মুক্ত হাওয়া প্রাণ ভরে টানতে পারছি, তখন একথা স্বীকার করতে আর কোন বাধা দেখি না যে— একজন সামান্য নীরব কর্মী হিসাবে ৭০-এর নির্বাচনে আমার আওতাভুক্ত শ্রমিকদের আওয়ামী লীগে ভোট দিতে অনুপ্রাণিত করি, অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ করি। পাকবাহিনীর কড়া পাহারার মধ্যে থেকেও ২৬শে মার্চ থেকে আমি নিজেকে সামলিয়ে

মুক্তিবাহিনীকে যথাসাধ্য সাহায্য করি। আমার নিজ এলাকা, ঢাকা জেলার রায়পুরার মুক্তিবাহিনীর জন্য যে শেখ ফয়জুল্লার কাছে মনিঅর্ডার করেছিলাম, তা অসত্য নয়।

এ-ই বলে ওবায়দুর রহমান থামলো। ওবায়দুর আমার আবাল্য বন্ধু। বহু সুখ-দুঃখেরকথা আমরা পরস্পর বলাবলি করে থাকি। কথা দিয়েছিলাম, ওর অব্যক্ত কথা-ব্যথা একদিন সবাইকে বলবো। পনেরো বছর দেরীতে হলেও আমার অকৃত্রিম বন্ধু, স্বাধীন বাংলাদেশের একজন অখ্যাত অজ্ঞাত, ততোধিক অবিদিত মুক্তিযোদ্ধার অতুলনীয় ত্যাগ ও নজীরবিহীন নির্যাতনের কাহিনী যে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারলাম, তার জন্য আমি বড়ই স্বস্তি, শান্তি ও তৃপ্তিবোধ করছি।

'ইত্তেফাক' ঃ ২রা এপ্রিল ১৯৮৭

আমি পরাজয় দেখেছি

'আমি বিজয় দেখেছি' নিঃসন্দেহে একখানা বিশ্বস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এখনো রচিত হয়নি। (বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে সদ্য প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ' কোন ইতিহাস নয়– এ শুধুই 'দলিলপত্র সংগ্রহ)– প্রামাণ্য ইতিহাস রচনায় এম, আর, আখতার মুকুল-এর 'আমি বিজয় দেখেছি' অনবদ্য অবদান রাখবে। বহুজন প্রশংসিত ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় বিজ্ঞ সমালোচক ডঃ আনিসুজ্জামান বলেছেন "(এম, আর আখতার মুকুল) মুজিব নগর সরকারের প্রেস ও তথ্য বিভাগের পরিচালক ছিলেন। মুজিব নগর সরকারের প্রশাসনকে ভেতর থেকে অনেকখানি দেখার এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রক্রিয়াকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তিনি যা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন, যে সব দলিল সংগ্রহ করেছিলেন, যে সব বিষয় অনুমান করেছিলেন এবং প্রাসংগিক যে সব তথ্য পরে তাঁর গোচরীভূত হয়েছিল, তার সবই 'আমি বিজয় দেখেছি' গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে।"

'আমি বিজয় দেখেছি'র বস্তু নির্ভর সত্যনিষ্ঠ লেখক কোন কোন বিষয় শুনে লিখেছেন বলেই তাঁর এ সুন্দর বইটিতে কিছু ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব রণাংগনে (কুমিল্লার সালদা নদী থেকে শুরু করে সমগ্র সিলেট জেলা) হানাদার বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে বহু রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়। 'আমি বিজয় দেখেছি' ২৬১ থেকে ২৬৮ পৃষ্ঠার মধ্যে সে অঞ্চলের যুদ্ধের ঘটনাগুলি বিশ্বস্ততার সাথে ধরে রেখেছে। সেখান থেকে জানা যায় মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজীর অধীনে হানাদার বাহিনীর দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী ১৪ ডিভিশনকে 'পাকিস্তানের ইষ্টার্ণ কমান্ডে'র দায়িত্ব দেয়া হয়। এর অধীনে যে তিনটা শক্তিশালী ব্রিগেড ছিল, তার একটা আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া– ভৈরব বাজার এলাকায় আস্তানা গেড়েছিল বিগ্রেডিয়ার সাদুল্লার ২৭ তম ব্রিগেড। আখাউড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আশুগঞ্জ পূর্বাঞ্চলের এই তিনটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধই পরিচালনা করেন ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ। সম্প্রতি ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ খান-এর লেখা একখানা 'ডায়রী' দেখার সুযোগ হয়েছে। এতে পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধের পটভূমি থেকে শুরু করে হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনা পর্যন্ত সব কিছু আনুপূর্বিক হুবহু বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজীতে লেখা এ বইটির নাম 'ইষ্ট পাকিস্তান টু বাংলাদেশ'– প্রকাশ করেছেন, 'লাহোর 'ল' টাইম্‌স পাবলিকেশনস'– উর্দু বাজার, লাহোর, ১৯৭৫ সালে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পাকিস্তানীদের ধ্যান-ধারণা ও মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে এ বইতে। ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ খানের অনমনীয় মনোবল ও অননুমেয় ধৃষ্টতা দেখে অবাক হতে হয়। ৯১, ৫৪৯ সৈন্যসহ বাংলাদেশে আত্মসমর্পনের পরও ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ তার এ বইখানা উৎসর্গ করেছেন এই বলে 'যাদেরকে আমরা পরাজিত করেছিলাম, তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হলো' (টু দোজ হোম উই ফেইল্‌ড)।

তবে যুদ্ধ সম্পর্কিত ঘটনাগুলি বাস্তবিকই অনুধাবন যোগ্য। একজন সৈনিকের বিশ্বস্ত ডাইরী হিসাবেই এটাকে বিবেচনা করতে হবে। 'আমি বিজয় দেখেছি'র বর্ণনার সাথে এর অনেক, অনেক মিল ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। বৈসাদৃশ্য ও অমিল যেখানে যেখানে রয়েছে

আমি কেবল সে অংশটুকুই এখানে উল্লেখ করছি।

'আমি বিজয় দেখেছি' ২৬৩ পৃষ্ঠায় বলছে– 'পরাজিত হানাদার বাহিনীর সহযোগিরা এই সময় রাতের অন্ধকারে প্রায় ২৫ জন স্থানীয় বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করলো। ৭ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে জেনারেল কাজী তার বাহিনী নিয়ে ৮ মাইল পশ্চিমে মেঘনা নদীর পাড়ে আশুগঞ্জে এসে হাজির হলো।'

হানাদার বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছেড়ে পশ্চিমে পালাবার সময় স্থানীয় বুদ্ধিজীবী কয়েকজনকে হত্যা করে যায় সত্য কিন্তু তা' ৭ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে নয়– এ নৃশংস ঘটনা ঘটায় ৬ই ডিসেম্বর রাতে। আমরা তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে দশ মাইল উত্তরে অবস্থান করছিলাম; মৎপ্রণীত 'না বলা কথায়' উল্লিখিত আছে–'৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার। সকাল থেকে নর–নারী, শিশু উদ্বাস্তু মানুষ, দক্ষিণ দিক থেকে গলানিয়ার দিকে আসছে। ব্যাপার কি? বাড়ি-ঘর ফেলে আসা সোহাগপুর, ভাদুঘর, তালশহরের লোকের মুখে শুনলাম পাক বাহিনী পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে আশুগঞ্জের দিকে পিছু হটছে এবং গ্রামের লোকজনকে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র সরে যেতে বলছে। দশটার দিকে কালির বাজার গিয়ে শহরের নানা খবর পাই। সদ্য শহর থেকে ফেরা লোকের মুখে শুনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে একটি পাঞ্জাবী সৈন্যও নেই, মানুষ জনও নেই। জনহীন, শূন্য শহর। ঠিক তখনই একজন এসে বললো ঃ সর্বনাশ হয়ে গেছে। পাঞ্জাবী শালারা যাওয়ার আগে গেলো রাতে প্রফেসর লুৎফর রহমানকে মেরে গেছে।.....একে একে আরো খবর এলো। কেবল প্রফেসর লুৎফর রহমানই নয়– সরাইলের এডভোকেট সৈয়দ আকবর হোসেন (বকুল) ও তার ছোট ভাই সৈয়দ আফজল হোসেন সহ বহু লোককে গত রাতে জেলখানা থেকে নিয়ে কুড়ুলিয়া খালের পাড়ে গুলী করে মারে।' (না বলা কথা–পৃঃ ৯৯)

আসলে ৭ই ডিসেম্বর রাতে নয় ৬ই ডিসেম্বর রাতে জেনারেল আবদুল মাজিদ কাজী তার বাহিনী নিয়ে আশুগঞ্জে চলে যায়। ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ খানও সেকথাই বলছে 'সূর্যাস্তের পর পরই আমরা তালশহর আশুগঞ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করি। ১২ এফ, এফ, ৩৩ বেলুচ ও ১২ আজাদ কাশ্মীর বাহিনীকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাইরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো– ৬ই ডিসেম্বর শেষ রাতে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছেড়ে এলাম। (ইষ্ট পাকিস্তান টু বাংলাদেশ–পৃঃ ১৩৮)।

'আমি বিজয় দেখেছি' আরো বলেছে ২৭ ব্রিগেডের জোয়ানরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আশুগঞ্জে থাকা সত্ত্বেও তিনি ডিনামাইট দিয়ে ভৈরব ব্রিজের একাংশ উড়িয়ে দিলেন। এই সংবাদে মেঘনা নদীর পূর্বতীরে অবস্থানরত ২৭ ব্রিগেডের জোয়ানরা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলো। চারদিকে পাক বাহিনীতে তখন খালি পালাবার পালা। এরা সব নৌকা করে নদী পার হয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় ভৈরবে এসে হাজির হলো। ওপারে তাদের বিপুল রসদ ও সমরাস্ত্র পড়ে রইলো। এটা হচ্ছে ১১ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতের কথা।

('আমি বিজয় দেখেছি'–পৃঃ২৬৪)

'পাকিস্তান টু বাংলাদেশ' কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে। ৭ই ডিসেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পাক বাহিনী আশুগঞ্জে অবস্থান করে এবং এই তিন দিন তারা ভারতীয় ১৭ রাজপুত, ৫৭ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্যাংক স্কোয়াড্রেন, ১০ বিহার ও ২ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট–এর

সাথে যুদ্ধ করে। ৯ই ডিসেম্বর সকাল ১০টার দিকে মেঘনা ব্রিজের একাংশ উড়িয়ে দেয় সত্য কিন্তু তারপরও স্বাধীনতা যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য আশুগঞ্জ যুদ্ধ পুরোদমে অব্যাহত থাকে। মেঘনা ব্রীজ উড়িয়ে দেয়াতে 'পাক বাহিনীর জোয়ানরা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলো'– এটা ঠিক নয়। মুক্তি বাহিনীর সহায়তায় ভারতী ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আশুগঞ্জের দিকে অগ্রসর হচ্ছে,আকাশ থেকে বিমান আক্রমণ, পূর্বদিক থেকে ট্যাংক বাহিনীর দুর্জয় অভিযান– এই সব সংকটের মোকাবেলা করেছে পাক বাহিনী। তখনকার যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ ৯ই ডিসেম্বর তাঁর ডাইরীতে বলছে–'৯ই ডিসেম্বর একটি বিস্ময়কর দিন। সকাল থেকেই আমরা বিমানাক্রমণের আশংকায় প্রস্তুত হয়ে আছি। আজ ভয়ংকর রকম নতুন কিছু ঘটবে বলে মনে করিনি। আমি মনে করেছিলাম, আশুগঞ্জ আক্রমণের জন্য শত্রুপক্ষ আরো একদিন সময় নেবে। কিন্তু না, আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় নতুন আরেক ব্রিগেড সৈন্য আশুগঞ্জ আক্রমণের জন্য এগিয়ে এলো। সকাল আটটার দিকে দেখি, আমাদের ডান দিকের আকাশে শত্রু পক্ষের হেলিকপটার। আমাদের কামান গর্জে উঠলো। এর একটুখানি পরেই আমাদের বাম দিকে ট্যাংকের শব্দ শোনা গেল এবং সাথে সাথেই ট্যাংক থেকে গোলাবৃষ্টি শুরু করলো।'

তারপর উভয় পক্ষ থেকে দারুণ গোলাগুলি শুরু হয়। ঘন্টা দুয়েক যুদ্ধ চলার পর ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ বলছে– 'আমাদের বাম পাশে হঠাৎ ভয়ংকর রকমের একটা ভীষণ বিস্ফোরণ শব্দে আমরা চমকে উঠলাম। মেঘনা ব্রীজ উড়ে গেছে। আমাদের এক সৈনিক উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো ঃ ওহো সর্বনাশ! ব্রীজটি ধ্বংস হয়ে গেলো।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম– মন খারাপ করোনা। আরে, এতো আমাদের প্ল্যান মতোই করা হয়েছে।

আসলে কিন্তু আমি তখনো জানতামনা যে, এটা আমাদের জি, ও সির নির্দেশ মতোই হয়েছে। কিন্তু এটা আমি জানতাম যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটে তা সবই আমাদের হুকুমেই হয়– শত্রুদের নির্দেশে নয়। আমার ও কথায় সৈন্যরা বেশ আশ্বস্ত হয় এবং সাথে সাথে আমরা আবার পুরোদমে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ি। (ইষ্ট পাকিস্তান টু বাংলাদেশ পৃঃ ১৫২)'

৯ই ডিসেম্বর সারা দিনই যুদ্ধ চলে। দিবাবসনে ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লা বলছে– 'সূর্য অস্ত যাচ্ছে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে এমন সময় জি, ও, সি, ৩৩ বালুচ রেজিমেন্ট থেকে ফিরে এলেন। তাঁকে স্বাভাবিক ভাবেই খুশী খুশী দেখাচ্ছিলো। তবে ভারতীয় ট্যাংক নিয়ে তাঁকে আবার উত্তেজিত বলেও মনে হচ্ছিল। এতোক্ষণে আমারও চিন্তা করার ফুরসত মিললো। কেননা, ব্রীজ উড়িয়ে দেয়ার পর আমাদের পক্ষে আশুগঞ্জে থাকার আর কোন মানেই হয় না। ভাগ্য ভালো আমাদের তখনো অনেকটি ষ্টীমার ও র‍্যাফ্‌ট অক্ষত রয়েছে নদী পারাপারের কোন অসুবিধা হবে না।

'আমি জি-ও-সির কাছে কথাটা পাড়লাম। এখন শত্রুরা পিছু হটে যাচ্ছে– আজ রাতটাই সবচে উপযুক্ত সময়। আজকে আমরা আমাদের কামান-বন্দুক সমরাস্ত্র সব ওপাড়ে নিয়ে যেতে পারবো। কাল হয়তো শত্রুরা আরো শক্তিশালী হয়ে আক্রমণ শুরু করবে। সাথে সাথেই জি-ও-সি সম্মতি জানালেন।

সারারাত ভর আমরা সমরাস্ত্র ও সৈন্য পার করলাম। ..... আমরা যখন সম্পূর্ণভাবে ভৈরব বাজার এসে পড়েছি তখন দিনের সূর্য পূর্ব আকাশে উঁকি দিয়েছে। কিন্তু কুয়াশায় চারিদিক তখনো আঁধারে ঢাকা। তারো প্রায় একঘন্টা পর শত্রুবাহিনীর বিমান আকাশে দেখা দেয়। ১০ই ডিসেম্বরের দুপুরের দিকে শত্রুবাহিনী শূন্য আশুগঞ্জে প্রবেশ করলো। অথচ আকাশবাণী প্রচার করে ৯ই ডিসেম্বর নাকি (ভারতীয় বাহিনী) আশুগঞ্জ দখল করেছে। আশ্চর্য!' (ইষ্ট পাকিস্তান টু বাংলাদেশ–পৃঃ১৭৩)।

মোটের উপর ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ খানের 'ইষ্ট পাকিস্তান টু বাংলাদেশ' আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এম, আর, আখতার মুকুল যুদ্ধে গিয়েছেন, যুদ্ধ দেখেছেন বলেই সগর্বে বলতে পারলেন–'আমি বিজয় দেখেছি।' ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লা স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধ করতে করতে পাকিস্তানের পরাজয় দেখেছেন। তিনিও সরোষে বলতে পারতেন, 'আমি পরাজয় দেখেছি'।

ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ পাকিস্তানের পরাজয় দেখেছেন ভৈরবে বসে। 'আমি ১৫ তারিখে সকালে এক নির্দেশ জারি করেছিলাম যে, ১৬ই ডিসেম্বর খুব প্রত্যুষে আমরা শত্রুকে আক্রমণ করবো। স্থির করা হলো, মেজর নঈম ও ৩৩ বেলুচ আক্রমণ পরিচালনা করবে। আর আমাদের দুটি ট্যাংক ওদের সাহায্য করবে।

সন্ধ্যার পর আমাদের ট্যাংক দু'টিকে রেল-লাইনের পাশের রাস্তা দিয়ে চালিয়ে শত্রু আক্রমণের জন্য নির্দিষ্টস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু মেজর নঈম এ স্থান থেকে আক্রমণ করাকে পছন্দ করলো না। আমি তার যুক্তিকে মেনে নিয়েও বলি, ঠিক আছে, তুমি তোমাদের কোম্পানী নিয়ে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের ওপাড়ে চলে যাও। আমি এই মাঝরাতের মধ্যেই তোমাকে পরবর্তী নির্দেশ দিচ্ছি।'

সেখান থেকে আমি রেললাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে ডিভিশনাল ট্যাক্‌নিকাল হেড কোয়ার্টারের দিকে রওনা দিই। আমি তখন ভাবছিলাম, মেঘনার ওপাড় 'সাইলো'র উপরকার শত্রু আর্টিলারী অবজারভেশন যদি আমাদের অবস্থানকে লক্ষ্য করতে না পারে, তা হলে এই রাতটা শান্তিতেই কাটানো যাবে।

আগামী রাত পর্যন্ত আক্রমণ স্থগিত রাখার আমার নির্দেশটি ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার অনুমোদন করলো।

আমি তখনো হেড কোয়ার্টারের সাথে আলাপ চালিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় সিলেট ব্রিগেড থেকে জানতে চাইলো– আচ্ছা, আমরা আত্মসমর্পণের অর্ডার পাচ্ছি– এই সংবাদ কি সত্যি? আমরা সবাই দারুণ ভাবে শক পেলাম। আমাদের লোকজন উত্তেজিত কণ্ঠে নানাভাব ব্যক্ত করতে লাগলো।

ঃ ননসেন্স।

ঃ এটা ভুল।

ঃ এ একটা মিথ্যা মেসেজ।

বাসিত (জি, এস, ও,) দৃঢ়কণ্ঠে সিলেটকে বলে উঠলো– এ সব সংবাদে কান দেবে না!

এটা শত্রুপক্ষের মিথ্যা ছল।

তারপরই বাসিত ইষ্টার্ণ কমান্ডের হেড কোয়ার্টারের সাথে রেডিওতে যোগাযোগ করতে লাগলো– মনে হচ্ছে শত্রু পক্ষ মিথ্যা সংবাদ রটাতে শুরু করছে। আমরা সিলেট থেকে জানতে পারলাম, কে নাকি তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছে।

অন্য প্রান্ত থেকে জবাব এলো– তোমরাও শিগ্‌গিরই এ সংবাদ পাচ্ছো। তার কিছুক্ষণ পরেই ঢাকা থেকে আমাদের অফিসার বিস্তারিত সংবাদ দিতে শুরু করলেন।

বাসিত প্রতিবাদ করে বলে উঠলো— আল্লার দোহাই, এ কথা আর পরিষ্কার করে বলবেন না– এ বড় মর্মবিদারক সংবাদ।

প্রকৃত সংবাদ পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে– অপর প্রান্ত থেকে বলে 'আমরা ইতিমধ্যে আমাদের গোপন 'কোড' সব পুড়িয়ে ফেলেছি।

আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। কৈ, আমাদের সাথে তো কোন রকম পরামর্শ করা হয়নি। এমন কি আমরা তো কোন রকম সতর্কতামূলক অর্ডারও পাইনি।

তারপর আমরা যে লজ্জা ও অপমানের পঙ্কে নিমজ্জিত হই, তা আর লেখার নয়। পাকিস্তান যুদ্ধে পরাজিত হলো। আমরা পূর্ব দিকে পরাজিত হলাম, আর পশ্চিমে পারলাম না জয়লাভ করতে। আমরা এতোদিন কূটনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পরাজিত ছিলাম, এখন সামরিক দিক দিয়েও পরাজিত হলাম। আমরা সম্মুখ সমরে না গিয়েও যুদ্ধে পরাজিত হলাম। আমার মনের কানে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো– 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা নির্ভর করে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর।'

পূর্ব পাকিস্তান দ্রুত 'বাংলাদেশে' পরিণত হয়ে গেলো।'

(ইষ্ট পাকিস্তান টু বাংলাদেশ পৃঃ ১৮৩–৮৫)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কেউ দেখেছেন ঐতিহাসিক 'বিজয়' আবার কেউ কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন শোচনীয় 'পরাজয়'। কোন আবেগ নয়, কোন অনুরাগ বা বিরাগের কথাও নয়, এই জয়-পরাজয়ের মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যুক্তি নির্ভর ইতিহাস। কোন্ দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যথার্থ ইতিহাস লেখা হবে?

'মাসিক ডাইজেস্ট' ঃ এপ্রিল ১৯৮৬

দুটি ছেঁড়া পাতা

এমনটি তো কোনদিন হয়নি। যতই ভাবেন, ততোই অকূলে পড়েন। অন্যেরা জানুক আর নাই জানুক, শরীফ স্যার নিজে তো জানেন, কোনদিন– হ্যাঁ, উনপঞ্চাশ বছরের সাংবাদিকতার জীবনে কোন ঘটনাই তাঁকে অমন সংকটাপন্ন করতে পারেনি।

ঃ তোমার কি হয়েছে, শুনি? অতোই যদি ভাবনা, তো এ দুনিয়া ছেড়ে দরবেশ হয়ে গেলে পার। রুমে ঢুকে হাঁকডাক শুরু করে দেন রহীমুন্নেসা। কোন সময় চা দিয়ে গেলাম– হুঁস আছে?

অনেকটা ধরমর করে উঠেন শরীফ স্যার। খাটের বাজুতে বসে টেবিলের উপর থেকে চার কাপের জন্য হাত বাড়ালেন।

ঃ না-না। এইটা নিও না। বাধা দিলেন রহীমুন্নেসা– দাও, দাও– আমি গরম করে আনি।

ঃ না– দাও। এতেই হবে।

শরীফ স্যার চার কাপ হাতে নিলেন। স্ত্রী রহিমুন্নেসা বসলেন পাশের চেয়ারটায়।

ঃ আচ্ছা, তোমার কী মনে হয়?

ঃ আমার? আমার আবার কী মনে হবে? রহীমুন্নেসা মুখ গম্ভীর করে বলেন– আমি অতশত বুঝিও না, ভাবিও না।

ঃ ভাবো না? এক রাশ বিস্ময় ঝরে পড়ে শরীফ স্যারের কণ্ঠে–অমন একটা ঘটনা। তোমার মনে একটুও আঁচড় দিলো না?

রহীমুন্নেসা পানের বাটা থেকে একটুখানি মতিহারী তামাক-পাতা ছিঁড়ে মুখে গুঁজতে গুঁজতে বলেন– আমি আছি আমার সংসার নিয়ে– রাজ্যের কথা চিন্তা কর তোমরা ঝি-পুত মিলে।

হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠলেন শরীফ স্যার। চোখে মুখে খুশির আভা ছড়িয়ে পড়লো। এক চুমুকে চা'র কাপটা নিঃশেষ করে হাসি-হাসি মুখে বলেন ঃ আশু-রাশুরা কিছু বলেছে নাকি তোমার কাছে?

ঃ আমার কাছে আবার বলবে কি?– নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দেন রহীমুন্নেসা–ওরা সেদিন বলাবলি করছিলো, আমি শুনলাম।

ঃ তাই নাকি? এবার আগ্রহটা উপচে পড়ে শরীফ স্যারের চোখে মুখে–ওদের কি ধারণা? ওরা কি বলে? আরামসে পান চিবুতে চিবুতে রহীমুন্নেসা বলেন

ঃ ওরা তো বলে ওদের আব্বা নাকি পাগল হয়ে গেছে।

ঃ এ্যাঁ! তাই বলে নাকি?

ঃ বারে বলবে না? আমিও তো বলি। সামান্য একটা ছেঁড়া পাতা নিয়ে তুমি যা শুরু করেছো– খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। শুধু একই কথা ঃ এ কথাগুলো কা'র? কারা একে অমন টর্চার করলো?

ঃ সত্যিই বল তো রাশুর মা, কারা একে এমন নির্মমভাবে অমানুষিক নির্যাতন করলো?

শরীফ স্যারের কথায় বিষাদের করুণ সুর।

রহীমুন্নেসা পান-মুখে নির্বিকার কণ্ঠে বলেন ঃ ওরা তো একবার পড়ে বলে দিয়েছে– আরে, এটা আবার কোন প্রোবলেম নাকি– একবার পড়লেই তো বোঝা যায়, এ জঘন্য জল্লাদের কাজটা করেছে হানাদার পাক বাহিনী। আর এ লেখাটা নিশ্চয়ই কোন মুক্তিযোদ্ধার আত্মকাহিনী।

ঃ তা-ই নাকি?

ঃ হ্, তোমার ছেলেরা তো এই বলে।

শরীফ স্যারের চোখ, মুখ, সমস্ত অবয়বে হঠাৎ কেমন যেন এক বিষাদের রেখা ফুটে উঠতে থাকে। নিশ্চল নয়নে ভেসে উঠে সেদিনের ছবি।

সভা-সমিতি না থাকলে শরীফ স্যার আজকাল বিকালে বাসা থেকে বেরোন না। সেদিনও মাগরেবের নামাজ সেরে বেরিয়েছেন। স্যারের পরণে শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, সকল ঋতুর সেই চিরাচরিত হাতে ধোয়া পাজামা পাঞ্জাবী, পায়ে চামড়ার চটি আর মাথায় খয়েরী রংয়ের কিস্তি টুপী। এক মুঠ সাদা দাড়ি আর খয়েরী টুপী পরতে শুরু করেছেন এই মাত্র সাত-আট বছর। কিন্তু সাংবাদিকতা করছেন গত চল্লিশ বছর ধরে। এককালে হাই স্কুলের ইংরেজীর মাস্টার ছিলেন। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী মিলে শহরের দক্ষিণপ্রান্তে মাস্টার পাড়ায় একটা প্রাইমারী স্কুল করেন। শিক্ষকতা আর সাংবাদিকতা, মানে মফস্বলের সংবাদদাতার কাজ নিয়ে বেশ সুখেই আছেন শরীফ স্যার।

মেইলিং কাগজ পত্র সহ প্রথমে যান প্রেস ক্লাবে। সেখানে ঘন্টা খানেক কাটিয়ে পোস্টাফিস। বাসায় ফেরার পথে মুন্সেফ পাড়ার চৌরাস্তা–তাঁর চির পরিচিত বিশু দাসের দোকান থেকে কিনেন এক জুলী পান ও সোয়া শ'গ্রাম সুপারী। সুপারীগুলি বিশু দাস একটা কাগজে মুড়ে দেয়।

বাসায় ফিরে টেবিলের উপর পান-সুপারী রাখতে গিয়ে সুপারীর ঠোঙাটার উপর এমনিতে নজর পড়ে শরীফ স্যারের। ছাপানো কাগজ দেখে হঠাৎ স্যারের কৌতূহল হয়– লেখাগুলো পড়ার।

একটুখানি পড়ে চমকে উঠেন। সুপারী ক'টি রেখে শরীফ স্যার তড়িঘড়ি কাগজটা মেলে ধরেন টেবিলের উপর। মুচড়ানো, দুমড়ানো নিউজ প্রিন্ট কাগজ–ডিমাই সাইজ বইয়ের একটা ছেঁড়া পাতা। দু'পৃষ্ঠায় লেখা ছাপানো পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই– বইয়ের নামও নেই, সব ছেঁড়া। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেই শরীফ স্যার বিজলী বাতির আলোয় পড়তে লাগলেন লেখাগুলো।–

'ফিরে এলাম সে টর্চারিং ক্যাম্পে। হিংস্র চেহারার কিছু নতুন মুখ চোখে পড়লো। রকমারী অস্ত্রশস্ত্র, নানা রকম হাতিয়ার স্তূপ হয়ে আছে এক পাশে। ধারালো দা, ঝকঝকে ছোরা, সাদা তকতকে বেয়নেট, সোজা ও মসৃন সুন্দরী কাঠের লাঠি। এছাড়া চামড়া বাঁধানো ছড়ি, তেলতেলে হলুদ ও বেগুনী রঙের ইলেকট্রিসিটির তার, লোহার রড, গোলাপ ফুলের কাঁটা, লবন-মরিচ মায় অনেক কিছু।'

'এবার বিরাট আকৃতির জল্লাদ প্রকৃতির জুলফিধারী দু'টি লোক এগিয়ে এলো আমার

দিকে। তাদের লম্বা লম্বা গোঁফ, মাথায় বেণী বাঁধার মত লম্বা চুল, রক্ত জবার মত চোখ দেখলেই মন ভয়ে আঁতকে উঠে। পেশী বহুল হাত উঠিয়ে থাবা ধরা হিংস্র বাঘের মত দু'হাত ধরে আমাকে উঠিয়ে নিল তারা। হাওয়াই সার্টটা খুলে ফেলে দিল নিচে। গেঞ্জিটাও এক হেঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ঝাপটা মেরে চিৎ করে ফেলে দিল উত্তরভাগে রাখা একটি টেবিলের উপর। পূর্ব দিকে মাথা পশ্চিমে পা। এবার আরও দু'জন এসে মিলিত হলো এদের সাথে। পা দু'টি নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে ফিতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো টেবিলের পায়ার সাথে। এভাবে মাথাটিকেও নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে শক্ত করে অপর দু'পায়ার সাথে বাঁধলো আমার হাত দুটি। এবার দু'ধারে দু'জন করে দাঁড়িয়ে গেলো হাতে রড ও লাঠি নিয়ে। শুরু হলো পৈশাচিক নির্যাতন। 'শপাং করে দক্ষিণ দিক হতে নাভীর উপর এসে পড়লো চাবুকের প্রথম আঘাত। সাথে সাথেই ভীষণ জোরে উত্তর দিক হতে পড়লো আর একটি। সারা দেহ ঝিমঝিম করে উঠলো। প্রতিটি শিরা উপশিরা বয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়লো বিষময় ব্যথা। একচুল নড়বার ছিল না কোন উপায়। মাথাটা ঝুলে রয়েছে নীচের দিকে। সারা দেহের ব্যথা বিদ্যুতের ন্যায় এসে জমা হচ্ছে মাথায়। অবধারিত মৃত্যুর জন্য বোলআনাই প্রস্তুত হয়ে গেলাম। আঘাতের পর আঘাত আসতে লাগলো বৃষ্টির মত। চীৎকার দিয়ে পড়তে লাগলাম কলেমা তাইয়েবা– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। পুনঃ পুনঃ ডাকতে লাগলাম আল্লাহকে। আঘাতের বিরাম নেই। দক্ষিণ দিকের আঘাতগুলো আমার পেট ও বাম দিকের সব হাড়গুলোকে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। গায়ের চামড়া যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছিটকে পড়ছে। চোখ দুটো ফেটে যেন রক্ত বেরুবে। 'লা ইলাহা'র চীৎকার ধ্বনি বন্ধ করার জন্য নেকড়া গুঁজে দিলো মুখে। খানিক পরেই খুলে ফেললো তা। কিন্তু মুখ দিয়ে চীৎকার ধ্বনি আর বেরুচ্ছিল না তখন। লালা ও কফ গাল গণ্ড বেয়ে পড়তে লাগলো নীচে।"

ঃ ওমা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী পড়ছো এখন– নামাজ পড়বে না?

স্ত্রী রহীমুন্নেসার কণ্ঠে সম্বিত ফিরে পেলেও শরীফ স্যার তখনো সম্ভ্রস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন একাত্তুরের সেই লোমহর্ষক রক্তাক্ত দিনগুলির মধ্যে।

ঃ ওমা, কথা বলছো না যে? আজান পড়ে গেছে, হুঁস আছে?

কোন কথা না বলে শরীফ স্যার ছেঁড়া পাতাটা এগিয়ে দিলেন স্ত্রীর দিকে ঃ পড়-দ্যাখো, কি অমানুষিক নিষ্ঠুর নির্যাতন।

সেদিন থেকেই শুরু।

বড় ছেলে আশরাফুল হক আশু বিএ পাশ করে হাই স্কুলে মাষ্টারী করে। দ্বিতীয় ছেলে রাশেদুল হক রাশু এস এস সির পর ঢুকেছে স্থানীয় সুতা-মিলে। বয়েস যথাক্রমে চব্বিশ আর বাইশ। দুছেলেকেই ডেকে আনলেন শরীফ স্যার ঃ আচ্ছা বাবারা, তোমরা বল তো এ হিংস্র, অত্যাচারী নরপশু কারা? কারা একজন ইনসান–মানুষের উপর অমন নৃশংস অত্যাচার করতে পারলো?

বাংলাদেশের চলতি হাওয়ায় বর্ধিত আশু-রাশু এক নজর ছেঁড়া পাতাটা পড়ে দুজনে প্রায় এক সুরে বলে উঠে ঃ এ আর পড়তে হবে না আব্বা, এক লাইন পড়েই বুঝে ফেলেছি– এটা হানাদার পাকিস্তান আর্মির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কাহিনী। কোন এক মুক্তি পাগল বাঙালী

তরুণ ভাগ্যক্রমে জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে এ কাহিনী বলছে।

শরীফ স্যারের মন শান্ত হয় না। সায় দিতে পারছে না ছেলেদের কথায়। এ যদি মুক্তিবাহিনীর সদস্যই হবে তা হলে ওর মুখে 'জয় বাংলা'র বদলে যে শুনি– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্?

আশু-রাশু দু'জনে হেসে উঠে ঃ একি বলছেন আব্বা, 'মুক্তি' বলে কি সে মুসলমান নয়? মরবার সময় মুসলমান 'কলেমা' পড়বে না?

হ্যাঁ তা তো ঠিক কথাই? শরীফ স্যার ভাবেন, মুসলমান মুসলমানই। পেশা হিশাবে সে যা-ই গ্রহণ করুক না কেন, তাতে মুসলমানের মুসলমানত্ব ঘুচে যায় না। আর একজন সত্যিকার মুসলমান তো জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেমুসলমান।

কিন্তু তা'তেও শরীফ স্যারের মনের খচখচানী যায় না। লোকটা না হয় মুসলমানই কিন্তু যারা তাকে এমন নৃশংস ভাবে মারলো, টর্চার করলো, তারা কারা?

সেদিন শুক্রবার। সকালে চা খেয়ে গেছিলেন মাছ বাজারে। কিন্তু মাছ তরকারী না কিনে খালি ব্যাগ হাতে প্রায় ছুটে এলেন শরীফ স্যার।

ঃ এই আশুর মা–রাশুর মা, দেখে যাও ইউরেকা, ইউরেকা– শরীফ স্যারের উল্লসিত চীৎকার শুনে দৌড়ে আসেন রহীমুন্নেসা।

ঃ কি-কি পেয়েছো, দেখি? ও মা বাজার–বাজার কোথা?

ঃ আরে রাখ তোমার বাজার। মাছের থলিটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে পাঞ্জাবীর বুক পকেট থেকে বার করলেন বইয়ের পুরনো একটা পাতা। হ্যাঁ ডাক-ডাক তোমার আশু-রাশুকে।

ছেলেরা এলে অনেকটা রাজ্য জয়ের তৃপ্তি নিয়ে শরীফ স্যার বলতে লাগলেন ঃ সকালে উঠে ঠিক করি, না আজ প্রথমেই যাবো বিশু দাসের দোকানে। তাই মাছ-বাজারে না গিয়ে চলে যাই মুদেফ পাড়া। আর আল্লার কি কুদরত দেখো খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম ঐ বইয়ের আরেকটি পাতা। আর এ পাতাটাই পরিষ্কার করে দিয়েছে সব।

আশু-রাশু আর ওদের আম্মা রহীমুন্নেসা হুমড়ি খেয়ে পড়লো ছেঁড়া কাগজটার উপর। রহীমুন্নেসাই অনুচ্চ কণ্ঠে জোরেজোরে পড়তে লাগলেন– 'শিকল পরা দিনগুলি পৃষ্ঠা–৮৯।

সি, আই, ডি, অফিসার ঃ কতদিন ধরে আপনি জে, আই, এর অফিস সেক্রেটারী?

আমি ঃ ঊনসত্তরের শেষের দিক থেকে আমি সি.টি জে-আই-এর অফিস সেক্রেটারী

অফিসার ঃ এস-কে এর অপহরণ সম্পর্কে কি আপনি কিছু জানেন?

আমি ঃ কিছুই জানি না– তাকে আমি জীবনেও দেখিনি।

অফিসার ঃ তাদের বাসা আপনার বাসা থেকে কত দূরে?

আমি ঃ বাসা তো আগে চিনতাম না। আমাকে গ্রেফতার করে তাদের বাসায় নিয়ে যাওয়ার পর তাদের বাসা চিনলাম। আমার বাসা আগা মসিহ লেনে আর তাদের বাসা গোলকপাল গাঙ্গুলী লেনে।

অফিসার ঃ তাদের সাথে আগে থেকে আপনার কোন পরিচয় ছিল?

আমি ঃ পরিচয় তো দূরের কথা– তাদের পরিবারের কোন লোককেই আমি জীবনে দেখিনি।

অফিসার ঃ সিনেমা দেখতেন?

আমি ঃ না।

অফিসার ঃ তারা আপনাকে টি, আই, পি-তে সনাক্ত করলো কিভাবে?

আমি ঃ বাহরে! আমাকে এরেষ্ট করে তাদের বাসায় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা রাখলো, আমার সাথে কথা-বার্তা বললো, পরিবারের সবাই মিলে আমার উপর নির্যাতন চালালো– তারপরেও টি,আই,পি-তে সনাক্ত করতে পারবে না?

"এসব নানা প্রশ্নের পর আমাকে অন্য কক্ষে নিয়ে কিছু সময়ের জন্য রাখা হলো। জোহরের নামাজ ওখানেই আদায় করলাম। বেলা তিনটার দিকে আমাকে আবার জেলে পাঠাবার সময় সে অফিসারটি বললেন– 'দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলছি, কোন পুলিশ অফিসার হিসাবে নয়, একজন শুভাকাংখী হিসাবে। তা'হলো, এখন আপনি জামিনের চেষ্টা করবেন না। কারণ, প্রেসিডেন্ট নির্দেশ পঞ্চাশ অনুযায়ী এসব কেসের কোন জামিন হবে না। খামখা উকিলদের পয়সা দিয়ে লাভ কি? আমরা তদন্ত করবো। এরপর কিছু পাওয়া না গেলে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দিবো। আপনি মুক্তি পেয়ে যাবেন। আর কিছু পাওয়া গেলে চার্জশিট দেবো– কোর্টে কেস চলবে।

আমি শুভাকাংখীর উপদেশকে মাথা নেড়ে সমর্থন জানিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমার আবাসস্থল জেলের উদ্দেশ্যে। এ সময় তাঁর নামটি যে শামসুদ্দিন জিজ্ঞেস করে জেনে আসতে ভুল করিনি।

ঃ হয়েছে হয়েছে, থাম। শরীফ স্যার বাধা দিয়ে বল্লেন–আর পড়তে হবে না। এবার বলতো বাবারা, এ ছেঁড়া পাতার কাহিনীটা কোন্ সময়ের?

এ আচমকা প্রশ্নবাণে আশু-রাশু দুজনেই হঠাৎ কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো। ছেঁড়া পাতার দুটি ঘটনা এক হয়ে দীর্ঘদিন ধরে লালিত তাদের বিশ্বাসের উপর দারুণ একটা বাড়ি দিয়েছে ঃ ওমা, এযে দেখছি স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের কাহিনী। তা'হলে?

তাদের মুখে সহসা কোন কথাই ফুটলো না।

সত্তর বছরের বৃদ্ধ পিতার সামনে বিহ্বলের মতো নিরুত্তর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো নতুন প্রজন্মের দুটি সন্তান– আশু আর রাশু।

'দৈনিক জনতা' ঃ ঈদ সংখ্যা ১৯৯০

স্বপ্ন ভংগ

মানীর মান আল্লাই রাখেন। মানুষ চেষ্টা করে মানী-গুণী হতে পারে না–আবার মানী লোকের মানও কমাতে পারে না। সবকিছুই কাদের গণি আল্লাহতায়ালা করে থাকেন।

এ কথা আজ সবার মুখে। স্কুল-কলেজ শিক্ষিত মহল থেকে শুরু করে বন্দর রোডের কর্মব্যস্ত ব্যবসায়ী, মার্চেন্টের গদীঘর সবখানে।

গদীঘরের বেপারী –আড়তদার–দালাল সবাই সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চোখ বুঁজে বলাবলি করে–'আরে, আল্লাহ যারে দেয় ছাপ্পর ফাইড়া দেয়।'

ঃ হ, ভালা কথা মনে করাইছ।–আরেকজন উৎসাহী হয়ে উঠে– সেদিন নবীপুরের মাদ্রাসায় ওয়াজ হইছিল। আমীর সাব কইছেন, যে-লোক আল্লার রাস্তায় দশ পা আগায়, আল্লাহ তার দিকে বিশ পা আগাইয়া আসে।

ঃ আমাদের হাজী সাব ত দুই-দুইবার মক্কায় হজ্জ কইরা আইছে।

ঃ দুইবার গেছেন ঠিকই। –একজন সংশোধন করে–এইবার নাকি বিবি সাবরে লইয়া যাইবেন।

ঃ আরে তাইনের কোনো টাকার অভাব আছে নাকি? হাজী সাবের এক ছেলে ত সউদীতে আইজ চার-পাঁচ বছর।

ঃ হ-হ, সেই ছেলেরেই শাদী করাইতেছে কলেজের পিনসিপালের মাইয়ারে–

ঃ আরে এইডারেই ত কইছে ফাডা কপাল।

ঃ আমরার এই হাজী সাবের লাগান কপাইল্যা মানুষ আর কয়ডা আছে আমরার দেশে?

ঃ আচ্ছালামালেকুম। আচ্ছালামালেকুম। – হাজী সাবকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সমস্বরে বলে উঠে সবাই–আমরা অতক্ষন আপনের কথাই বলাবলি করতে ছিলাম।

ঃ ওয়া আলায়কুমুস্সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।–সহী করে সালামের জবাব দিতে দিতে গদী ঘরের উপর উঠে এলেন হাজী কুদরুতুল্লাহ্সাহেব।

হাজী কুদরুতুল্লাহ বন্দর বাজারের এক ডাকের মানুষ। পৈতৃক ব্যবসা ধান-চাউলের কারবার দিয়েই ব্যবসায়ী জীবনের শুরু। নিজের চেষ্টা তদ্বির আর, হাজী সাব নিজেই ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে সলজ্জভাবে বলেন– সব আল্লাহর কুদরতে। হাজী সাবের আজ রমরমা ব্যবসা। চাউলের আড়তদারী তো আছেই, টানবাজারে রয়েছে তার সিমেন্ট-রড ও সি,আই, শিটের দোকান, রাণীবাজারে আছে সরিষা তেলের মিল, আর নদীর পাড়ে রয়েছে এইচ, কে, স মিল অর্থাৎ হাজী কুদরতুল্লাহ স মিল। হাজী সাব বিশ্বাস করেন, এসব কিছু তাকে আল্লাহ দিয়েছেন। এবং সেজন্যেই তিনি বছরে একবার, 'চিল্লা' দিয়ে থাকেনই। দ্বীনের খেদমতে মেহনত করছেন বলেই আল্লাহ রহমানুর রহীম হাজী কুদরতুল্লার ব্যবসায়ে অমন বরকত দিচ্ছেন।রুজি-রোজগারে ডবল ফায়দা পাচ্ছেন। শুধু অর্থকড়ি দিয়েই নয়, মান-মর্যাদায়ওহাজী কুদরতুল্লার 'ইজ্জত' আজকাল বন্দরে-শহরে তথাকথিত মানওয়ালাদের চেয়ে কম নয়।

এই ইজ্জতের ফায়সালায় হাজী সাবের মান বাড়িয়ে দিয়েছে ছেলের বিয়েটা। ছেলের বিয়ে

ঠিক করেছেন প্রিন্সিপালের মেয়ের সাথে। কমলাগঞ্জ হাজী আলম কলেজের প্রিন্সিপাল টি, হোসেনের মেয়ের সাথে তার দ্বিতীয় ছেলের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। এই রোজার মাঝেই ছেলে 'সউদী' থেকে ছুটিতে আসছে–ঈদের পর পরই বিয়ের রুসমত হবে।

সোনালি ব্যাংকে এই সময়টাতে ভীড় কম। গ্রাহকদের আনাগোণা নেই বললেই চলে। বিশেষ করে ম্যানেজারের রুমটা একদম খালি। ম্যানেজারের সামনে প্রিন্সিপাল টি, হোসেন বসে।

গোঁফের নীচে হাসি লুকিয়ে ম্যানেজার সাব বললেন–একি শুনলাম প্রিন্সিপাল সাহেব, লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেললেন, আমাদের কিছুই জানালেন না?

ঃ তওবা–তওবা! একি বলছেন আপনি?–টি, হোসেন সিরিয়াস হয়ে বাধা দেন–আপনাদের ছাড়া মেয়ের বিয়ে দেবো, এমন কথাও ভাবতে পারলেন আপনি?

ঃ এই যে শুনলাম, ঈদের পরেই রুসমাত হবে।

ঃ ওহ্ এই কথা?–টি, হোসেনের মুখে এখন হাসির ঢেউ। হ্যাঁ, যা শুনেছেন তা ঠিকই শুনেছেন।

ঃ মেয়েটা তো বুঝি এবার বি, এ দিচ্ছে। তা এখনই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন?

হাসলেন টি, হোসেনঃ দেখুন, আপনি তো আমাকে জানেন বহুদিন থেকে। পছন্দসই, এই মানে নামাজী ছেলেই পাওয়া যায় না আজকাল।

ঃ হ্যাঁ, হাজী সাব যেমন পরহেজগার, শুনলাম ছেলেটা –

ম্যানেজারের কথা লুফে নিয়ে টি, হোসেন বলে উঠলেন–জ্বি, ছেলেটা এককালে আমারই ছাত্র ছিল। ওর স্বভাব চরিত্র আমার জানা আছে। এম, এ পাশ করে ক'বছর ধরে আরবে একটি বিদেশী ফার্মে আছে। ছেলেটি বরাবরই নামাজী।

ঃ তা'ছাড়া হাজী কুদরতুল্লা সাহেবের মত অমন আল্লাহওয়ালা মানুষ ক'জন আছে?–ম্যানেজার সাব তার কথায় সায় দিয়ে বলেন–হাজী সাব তো এবারও হজ্জ করতে যাচ্ছেন–সস্ত্রীক।

ঃ আস্‌সালামুআলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহ্।

সহী করে সালাম দিতে দিতে ম্যানেজারের কক্ষে ঢুকলেন হাজী কুদরতুল্লাহ সাহেব।

ম্যানেজার চেয়ার ছেড়ে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন ঃ ওয়া আলায় কুমুস্ সালাম। আরে, আরে অতোক্ষণ তো আপনার কথাই হচ্ছিলো। এই দেখুন, আপনার বেহাই সাবও এখানে।

হাজী সাব সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ডান পাশে তাকিয়ে প্রিন্সিপাল সাবকে দেখলেন। হঠাৎ যেনো একটু হকচকিয়ে গেলেন। মুখে একটু হাসি টেনে 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলে টেবিলের ও কোণায় ম্যানেজারের পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন হাজী সাব।

প্রিন্সিপাল হাত উঁচিয়ে প্রতি সালাম দিয়ে অপলক তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে।

হাজী সাব হাতে করে আনা চামড়ার ছোট্ট এটাচিটা টেবিলের উপর তুলে, এর চেইন ধরে টান দিলেন। এটাচির ভেতর হাত ঢুকিয়ে মুঠ করে বার করলেন কয়েক বাণ্ডিল পাঁচশ

টাকার নোট।

ব্যাংকের একটা ফরম সহ টাকার তোড়াগুলো ম্যানেজার সাবের দিকে ঠেলে দিতে দিতে ব্যস্ত-সমস্তভাবে হাজী সাব বলেন– নেন এই ট্যাহা আর ফরম। আপনে যেখানে যেখানে কইছিলেন সবখানেই সই কইরা দিছি।

ম্যানেজার টাকার তোড়াগুলির দিকে চোখ রেখে বলে উঠেন, টাকা তো অনেক কম মনে হয়। কত টাকা এখানে?

ঃ পঞ্চাশ হাজার। চট্ জবাব হাজী সাবের।

ঃ মাত্র পঞ্চাশ। ম্যানেজারের কণ্ঠে হতাশাব্যাঞ্জক বিস্ময়ের সুর–আপনি যে বল্লেন, লাখ দেড় লাখ টাকার কথা।

ঃ আরে হইছে–হইছে। বিজ্ঞের হাসি হাজী সাবের পান-খাওয়া মুখে। এই ট্যাহাইতো পাঁচ বছর পরে এক লাখ অইবো।

ঐ কথা বলেই হঠাৎ অতি ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন হাজী সাব।–বাকী যা করার আপনে কইরেন, আমি চল্লাম। গদী ঘরে বহুলোক বইয়া রইছে। আস্সালামু আলায়কুম–আস্সালামু আলায়কুম বেহাই সাব।

এই কথা বলেই সত্যি সত্যি হাজী সাব নিষ্ক্রান্ত হলেন ম্যানেজারের কক্ষ থেকে।

প্রিন্সিপাল টি, হোসেন সবই লক্ষ্য করছিলেন গভীর অভিনিবেশের সাথে। হাজী সাবের কর্ম-কাণ্ড দেখছিলেন আর একটা অজানা যন্ত্রণায় ক্রমেই মর্মাহত হচ্ছিলেন।

হাজী সাব চলে যেতেই শরবিদ্ধ শায়কের যন্ত্রণা নিয়ে মর্মবিদ্ধ টি, হোসেন গম্ভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলেন–হাজী সাব টাকাটা কি করতে দিয়ে গেলেন?

বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে প্রথমে একটু চমকে উঠলেও ম্যানেজার সাব নিজেকে সামলে নিয়ে হাসি মুখেই বল্লেন– ফিক্সড্ ডিপোজিটে রাখতে চান।

ঃ ফিকস্ড ডিপোজিট, মানে মেয়াদী সঞ্চয় তহবিল?

ঃ জ্বি। ম্যানেজার সিরিয়াস কণ্ঠে বললেন–বড় ভাগ্যবান মানুষ এই হাজী সাব। প্রায় প্রতি বছরেই তো ফিক্সড্ ডিপোজিটে টাকা রাখছেন।

প্রিন্সিপাল টি, হোসেন হঠাৎ যেনো বোবা হয়ে গেলেন। কোন কথা না বলে নির্বিকার, স্তব্ধ একটা ভাস্কর্য হয়ে বিমূঢ়ের মতো বসে রইলেন ম্যানেজারের সামনে। ক্ষানিকপর ধীরে ধীরে স্বগতোক্তি করলেন–হাজী সাবও সুদ খান! প্রিন্সিপাল ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন এবং ধীরে ধীরেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় ম্যানেজার কিছুই বুঝতে পারলেন না। প্রিন্সিপাল এই প্রথম সালাম না দিয়ে একজনের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ম্যানেজার কোন কিছু বুঝতে না পেরে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে প্রিন্সিপালের গমন পথের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন।

কেবল হাজী কুদরতুল্লার ঘরেই নয় কমলগঞ্জ বাজারের উপরই বজ্রপাতটা হলোঃ প্রিন্সিপাল সাব হাজী কুদরতুল্লাহর ছেলের সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ে ভেংগে দিয়েছেন।

ঃ কইলেই হইলো নাকি, বিয়া দিমু না? – হৈ-চৈ শুরু করে দিলেন হাজী সাব–আমি সবাইরে জানাইয়া দিছি, এখন বিয়া না হইলে আমি সমাজে মুখ দেখাইমু ক্যামনে? আমার কি কোনো মান-ইজ্জত নাই?

ঘটক তড়িঘড়ি ছুটলো প্রিন্সিপাল টি, হোসেনের বাসায়।

ঃ স্যার, একি কথা শুনছি?

ঃ হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। টি, হোসেন গম্ভীর হয়ে বলেন– সুদখোর বাপের ছেলের কাছে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো না।

ঃ একি বলছেন স্যার? হাজী সাব সুদখোর?

ঃ সে কথা হাজী সাবকেই জিজ্ঞেস করবেন।–টি, হোসেন বিস্মিত হয়ে বলে–আশ্চর্য, জমাতে গিয়ে তিন তিনটি 'চিল্লা' দিয়েছেন, হজ্জও নাকি করেছেন দু'বার, অথচ–অথচ এখনো মুসলমানই হতে পারলেন না!

ঃ একি বলছেন, স্যার,

ঃ কেন, তিনি জানেন না–আপনি জানেন না, আল্লাহ পাক কোরানে সুদকে 'হারাম' করে দিয়েছেন?

ঘটক কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মতো তাকিয়ে রইলো। প্রিন্সিপাল টি, হোসেন আগের মতোই বলতে লাগলেন–অথচ আমি নিজে দেখে এলাম হাজী সাব ব্যাংকে টাকা জমিয়ে জমিয়ে রীতিমতো সুদ খাচ্ছেন।

ঘটক লা-জওয়াব হয়ে মাথা নিচু করে ফিরে এলো।

সব শুনে হাজী কুদরতুল্লাহ সাহেব জ্বলে উঠলেন–ওহ্ তিনি বুঝি খুব খাঁটি মুসলমান হইয়া গেছেন? কেন প্রিন্সিপাল ব্যাংকে টাকা-পয়সা রাখেন না?

ঃ এ্যা! তাই নাকি? সত্যি?

ঃ হাছা না মিছা, ফোনডা দেওনা, এখনই হাতে হাতে প্রমাণ কইরা দিতাছি।

হাজী কুদরতুল্লাহ সাহেব রিসিভার উঠিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠেই শুরু করেন–কে? ম্যানেজার সাব নাকি? আইচ্ছা, একটা সত্য কথা কন–আমাদের প্রিন্সিপাল সাব আপনার ব্যাংকে ট্যাহা পয়সা রাখেন না?

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে জবাব আসে ঃ

–জ্বি, রাখেন।

হাজী সাব রিসিভার মুখের কাছে রেখেই গদী ঘরের লোকদের দিকে তাকিয়ে সোৎসাহে বলে উঠেন–এই শোন, শোন, ম্যানেজার সাব নিজে কইতাছেন প্রিন্সিপালও ব্যাংকে ট্যাহা রাখেন। তার মাইনে প্রিন্সিপাল সাবও সুদ খান।

সাথে সাথে টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে–হাজী সাব, শুনেন, শুনেন।

প্রিন্সিপাল টি, হোসেন সাব আমাদের ব্যাংকে টাকা রাখেন সত্যি কিন্তু তিনি তো ব্যাংকের ইন্টারেষ্ট মানে সুদ নেন না।

হাজী সাবের চোখ জোড়া স্থির হতে থাকে। শেষ কথা শোনার জন্যে রিসিভারটাকে কানের কাছে চেপে ধরে উৎকর্ণ হয়ে উঠেন।

ম্যানেজার সাব তখনো বলছেন–ইন্টারেষ্ট মানে সুদবিহীন লেনদেন এর শর্তেই প্রিন্সিপাল সাব আমাদের ব্যাংকে একাউন্ট খুলেছেন। তিনি কোন সময়ই ব্যাংক থেকে সুদ নেন না। নিরাপত্তার জন্যেই তিনি ব্যাংকে টাকা রাখছেন।

ফোনের কথা নয়, কে যেনো একটা শক্ত বাড়ি দিলো হাজী সাবের মাথায় আর সাথে সাথেই অস্ফুট চীৎকার দিয়ে হাজি কুদরতুল্লাহ সাহেব পড়ে গেলেন।

কিন্তু আসলে ঘরে উপস্থিত সকলে–বেপারী, সরকার, কয়াল, ভাণ্ডারী ছেলে সবাই অবাক হয়ে দেখলো, টেলিফোনের রিসিভারটা হাজী সাবের হাত থেকে ফসকে তীব্র, তীক্ষ্ণ কর্কশ একটা শব্দ তুলে ধপাস করে সেটের উপর পড়ে গেছে।

'কলম' ঃ জুলাই ১৯৯১

রাজাকার কাহিনী

একাত্তরের বিভীষিকাময় দিনগুলির কথা মনে করলে এখনো সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠে। আপনারা তো ভাব প্রকাশের জন্য হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া বলে একটা সুভাষণ ব্যবহার করে থাকেন। এ কথাটার মর্মার্থ আপনারা কে কেমন বোঝেন জানি না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, হানাদার বর্বর পাক সৈন্যরা নিরীহ বাঙালীর উপর কতো নির্মম ও হিংস্রভাবে যে অত্যাচার করেছিলো আমি তা হাড়ে হাড়ে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই বুঝেছি।

একাত্তরের সেপ্টেম্বর মাস। মুক্তিফৌজ তখন গেরিলা কায়দায় এখানে-ওখানে বোমা ফেলছে-ব্রীজ ভাঙছে। মিলিটারীও সাথে সাথে নিষ্ঠুর হাতে অপারেশন চালাচ্ছে। মিলিটারীর ভয়েই আমরা গ্রামের প্রায় সবাই ভৈরবপুর ছেড়ে ভৈরবের উত্তরে দুর্গম এলাকা শিমুলকান্দি, শ্রীনগর, আগানগর, রাজাঘাটায় চলে গেছি। আমার বয়স তখন হ্যাঁ ত্রিশ-বত্রিশ হবে। ভৈরব বাজারে পৈত্রিক পেঁয়াজের ব্যবসা করছি আর কিছুদিন কলেজে পড়াশোনা করেছি বলে নগর আওয়ামী লীগের সাথে কিছুটা জড়িয়ে আছি।

সেদিন শহরে মানে ভৈরবের খোঁজ-খবর নেবার উদ্দেশ্যেই কমলপুর আসি। ভৈরব বাজারের অদূরে কমলপুরে আমার মামার বাড়ি। আমার সামসু মামু তখন ভৈরব বাজারের বেশ ধনী ব্যবসায়ী। আমার আগমনের কথা কেমন করে যেন স্থানীয় রাজাকাররা জানতে পারে। সকাল বেলা সামসু মামু ফজরের নামাজের জন্য উঠেছে- পায়খানায় গিয়ে দেখে- সর্বনাশ, তার বাড়ির চারিদিকে যে মিলিটারী! মিলিটারী ও রাজাকাররা তার বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে।

মামু সন্ত্রস্ত হয়ে আমাকে ঘুম থেকে তুলে চুপি চুপি বলে- ভাগনে, আমরার বাড়ির চারদিকেই মিলিটারী।

আমি প্রমাদ গুণলাম। এখন উপায়?

ইতিমধ্যে ঘরের সবাই ঘুম থেকে উঠেছে। তখন তো বাড়ির সকলেই একঘরে থাকে- মেয়ে পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবাই এক ঘরে, এক সাথে। হ্যাঁ, সেদিন আমার আব্বাও সে ঘরে ছিলেন। আব্বা ও মামু নামাজ শেষ করেছে- সূর্য উঠতে আর বেশি দেরী নেই। উঠান ও ঘরের চারিপাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে, এমন সময় উঠানে অনেকগুলি বুটের থপ্ থপ্ শব্দ ও মানুষের অস্পষ্ট নিচু স্বরের কথাবার্তা শুনতে পেলাম। আমরা ঘরের শিশু-বৃদ্ধ, মহিলা-পুরুষ অতোগুলো মানুষ অজানা ভয়ে অতোটুকু জড়োসড়ো হয়ে বসে আল্লা-আল্লা করছি, আর দোয়া ইউনুস পড়ছিঃ লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ জোয়ালেমীন।

উঠান থেকে কে যেন ডেকে উঠলোঃ আপনারা ঘরে যে সকল পুরুষ মানুষ আছেন সবাই বাইরে আসেন। আর মেয়ে মানুষ ঘরের মধ্যেই থাকেন।

আব্বা-সামসু মামু ও আমি-আমরা পরস্পর চাওয়া চাওয়ি করে ইশারায় বলি- এখন কি করবো?

আব্বা সাহস দিয়ে বল্লেনঃ আল্লা ভরসা। চল যাই বাইরে। আল্লাহ রহমানুর রাহিম।

বাইরে থেকে তাগিদ এলোঃ আপনেরা পুরুষ মানুষ সব ঘর থাইক্যা শিগ্‌গির বাইরে আসেন।

বাইরে এসে দেখি, কয়েকজন ইউনিফরম পরা মিলিশিয়া আর আট-নজন বন্দুকধারী রাজাকার উঠানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা ঘর থেকে উঠানে নামতেই রাজাকার কমাণ্ডার আমার মামুর ঘরের উদ্দেশ্যে হাঁক দিলো–আপনেরা ঘরে যে মাইয়া লোক আছেন, তারার একজন একটা দাউ উঠানে ইঢাল দিয়া ফালাইয়া দেন।

মামী তো প্রথমে ভয়ে আঁতকে উঠে ঃ এ্যাঁ! আমরার ঘরের দাউ দিয়া আমরার মানুষরে কাটবো নাকি? পরক্ষণেই মনে পড়লো, দুর ছাই, মারতে হলে আমরার দাউ কেন, ওদের সাথেই তো মারণাস্ত্র বন্দুক আছে।

ঢিল ছুঁড়ে মামী একখানা বটি দাউ উঠানে ফেলে দিল।

রাজাকার কমাণ্ডার দা খানা হাতে নিয়ে আমাদের দিকে না এসে উঠানের দক্ষিণ কোণার নিমগাছটার কাছে চলে গেল। সেখানে গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা মামুর গাইটার কাছে গিয়ে দুই কোপে লম্বা দড়িটা কেটে আনলো।

ঃ হাজী সাব, আপনে তো ভৈরবপুর মুন্সী বাড়ির। আপনে এখানে আইলেন কে রে? আপনে যান–। আব্বাকে এই কথা বলে রাজাকার কমাণ্ডার মামুকে দেখিয়ে উর্দূ মিশ্রিত বাংলায় মিলিটারীকে বলে— এই, এই আদমী 'মুক্তি' কো শেলটার দিতা হ্যায়। ওয়াপদা অফিসে বোমা ফেলা হ্যায়– ওই রেলওয়ে ব্রীজ ডিনমাইট্‌সে ভাংগা হ্যায়– ওইসব মুক্তি উন্‌কো বাড়ীমে থাক্‌তো হ্যা। এ দু আদমী কো এরেষ্ট করো। এ কথা বলেই হাতের লম্বা দড়িটা মিলিটারীর হাতে তুলে দিলো।

মিলিটারী দড়ির একমাথা দিয়ে মামুকে ও আরেক মাথা দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলে।

ঘরের ভিতর মেয়েদের কান্নার রোল উঠলো।

আব্বা রাজাকার কমাণ্ডারের কাছে দৌড়ে এলেন ঃ আরে মিয়া এইডা কি করতাছ– তারারে বাইন্দা নিতাছ কে রে? এরা ত এসবের মাঝে নাই।

রাজাকার কমাণ্ডার আব্বার উপর ক্ষেপে উঠে ঃ হাজীসাব চুপ করেন। বেশি বাড়াবাড়ি কইরেন না–তা' অইলে কিন্তু আপনারেও বানতে কমু।

ঃ আব্বা আপনি ঘরে চইলা যান।– আমি বলি, কোন চিন্তা করবেন না। দেখি না তারা কোন্‌খানে নেয়।

মামু ও আমাকে নিয়ে রাজাকাররা ভৈরব রেল ষ্টেশনের পথে রওনা দিলো।

মামুর বাড়ি থেকে কিছু দূর এসে কমলপুরের গোপাটে উঠেছি, রাজাকার কমাণ্ডার আমাদের আদেশ করলো–বস এখানে।

বসলাম। বসে এদিক-ওদিকে তাকিয়ে দেখি, আশপাশের বাড়ি-ঘর থেকে মানুষ ভীত-শংকিত হয়ে আমাদের দেখছে– কাছে আসতে সাহস করছে না কেউ।

রাজাকার কমাণ্ডার তার সংগীদের সামনে এগুতে বলে আমাদের পাশে এসে বসে।

ঃ সামসু মিয়া, এখনও সময় আছে– দুই লাখ টাকা দেন, আপনাদের ছাইড়া দেই।

মামু আর্তস্বরে বলে উঠেঃ এইডা কি কও মিয়া, আমি অতো টাকা পামু কৈ?

ঃ তা অইলে যান– মিলিটারীর হাতেই তুইল্যা দিই। ওখান থাইক্যা যেমনে পারেন বাইচ্চা আইয়েন। এ কথা বলেই কমান্ডার সাব সামনের দিকে এগুতে থাকে।

আমরা কোন কিছু বুঝতে না পেরে গোপাটেই মামা-ভাগ্নে বসে থাকি। এখন আমাদের কী হবে?

কমান্ডারের নির্দেশ মত একজন রাজাকার আমাদের কাছে ফিরে আসে। আমাদেরই উত্তর পাড়ার –না, নামটা মনে পড়ছে না– সে এসে বললো —

ঃ কর্তা, কমান্ডার সাব কইছে, এক লাখ দিলেই ছাইড়া দিবেন।

মামু কোন চিন্তা ভাবনা না করেই তড়িঘড়ি জবাব দিলো ঃ যাও, তোমার কমান্ডার সাবকে আইতে কও।

কমাণ্ডার সাব আমাদের কাছে আসতেই মামু হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো ঃ আরে মিয়া, আমি অত টাকা পামু কোন্‌খানে?

ঃ এক লাখ টাকাও নাই ত আপনি আবার কোন্‌খানের ধনী অইলেন?– রাজাকার কমাণ্ডার মামুকে মুখ ভেঙচিয়ে বলে।

ঃ বিশ্বাস না হয়, আমি ষ্টীলের আলমিরার চাবি দিয়া দিতাছি তুমি নিজের হাতে খুইল্যা দেখ। মামু বিশ্বাসের সুরে বলে, বড়জোর দশ-বার হাজার টাকা হবে। আর আছে কিছু অলংকারপাতি।

ঃ না-না দশ বার হাজারে অইবো না। এই, দুইজনেরে ইষ্টিশনে লইয়া আয়। রাজাকারদের কড়া হুকুম দিয়ে কমাণ্ডার হন হন করে ষ্টেশনের পথে চললো।

তখন তো সব ট্রেন চলাচল বন্ধ। একটা শাট্‌ল ইঞ্জিন যাত্রীবাহী একটা বগী নিয়ে ভৈরব ও আশুগঞ্জ চলাচল করে। চলাচল করে মিলিটারীদের নিয়ে। আশুগঞ্জের সাইলো গুদাম ঘরটাকে করা হয়েছে মিলিটারীদের ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে যাদের ধরে নিয়ে গেছে, ওরা আর ফিরে আসেনি। আশুগঞ্জ নেয়া মানে যে বধ্যভূমিতে নেয়া এটা আমরা সবাই জানতাম।

নীরবে, নিঃশব্দে আমরা মামা-ভাগ্নে গাড়ীতে উঠলাম। কোন কথা নয়, কোন শব্দ নয়- মনের গভীরে নিশ্চিত মৃত্যুর মর্মদায়ক শংকা, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মানুষ বুঝি এমনি নির্বাক, বোবা হয়ে যায়?

চার-পাঁচজন মিলিটারীকে আমাদের পাহারায় রেখে রাজাকাররা নেমে গেল। কমাণ্ডার সাব গিয়ে বসলো ইঞ্জিনে ড্রাইভারের সাথে।

গাড়ী চলতে শুরু করে। মেঘনা পুলের কাছে যেতেই গাড়ীটা হঠাৎ থেমে গেলো। গাড়ী থেকে আমাদের গ্রাম, আমাদের বাড়ী দেখা যায়। আমি– শেষ বারের মত আমাদের গ্রাম, আমার জন্মভূমি, আমাদের মুনশীবাড়িটার দিকে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ কানে এলো নিচ থেকে কে যেন আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলছে। চোখ নামাতেই দেখি, রাজাকার কমাণ্ডার হাতে ইয়া বড় এক মগ নিয়ে চা পান করছে আর আমাদের উদ্দেশ্যে বলছে– এই যে

সামসু মিয়া, আর সময় নাই– এখনো যদি টাকা দিতে রাজী হন ত গাড়ী থাইক্যা নামাইয়া রাখি–

সামসু মামু জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললো ঃ আমি তো মিয়া কত্তবার কইলাম, অত টাকা আমার নাই–

ঃ তা অইলে যান, আমারে আর দোষতে পারবেন না। আমার কিস্তুক আর কোন হাত রইলো না– আশুগঞ্জেই যান।

রাজাকার কমাণ্ডারের ইংগিতে গাড়ী আবার চলতে শুরু করলো।

আশুগঞ্জ ষ্টেশনে পৌছুতেই মিলিটারীরা কালো কাপড় দিয়ে আমাদের চোখ বেঁধে দড়ির বাঁধন খুলে ফেলে। সামসু মামুকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো। আমি আর কিছু দেখি না। মিলিটারীর হাত ধরে হাঁটছি, উঁচু সিঁড়ি দিয়ে শত ফুট নিচে নামছি, তারপর বালুর উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে রেলওয়ের চোংগা পুলের নিচ দিয়ে সাইলোর দিকে যাচ্ছি এতটুকু বুঝতে পারি। এক সময় বুঝতে পারি আমরা ঘাসের উপর দিয়ে চলছি। তখন বুঝতে পারি– হ্যাঁ, আমরা রাস্তা ছাড়িয়ে ঘর বাড়ির কাছাকাছি হয়েছি। মিলিটারীরা আমাকে একটা পাকা মেঝের উপর তুলে হঠাৎ আদেশ করলো–হিয়া ঠিক্‌সে বাইঠো।

ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে আমি সাথে সাথে বসে পড়লাম। যেখানে বসলাম সেটা কোন ঘর না ঘরের বারান্দা না উঠান বুঝতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম না আমার সাথে মামু আছে কি না। আশেপাশে মিলিটারীর বুটের শব্দ ও লোকজনের নীরব পদচারণা টের পেলাম।

চোখ বাঁধা অবস্থায়ই আমার চোখের সামনে আমার অসহায়া স্ত্রী, শিশু পুত্র ও রোরুদ্যমান আব্বা-আম্মাকে দেখতে পেলাম। ওদের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে, 'আম্মা গো' বলে চিৎকার দিতে যাচ্ছি অমনি কানে এলো–ইয়ে, তুম মুসলমান হো?

নিমেষে আমার পরিবারের ছবিটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমি ভীত সন্ত্রস্তভাবে জবাব দিলাম– জ্বি।

ঃ আচ্ছা, কলমা বাতাও।

আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা মোহাম্মাদুর –বলেছি কি মিলিটারী কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো ঃ ঠিক হ্যায়, তুম্ সো যাও।

আমি সাথে সাথে মেঝের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঃ নেহি– নেহি। এয়ছা নেহি। মিলিটারী আদেশ করে– 'সীনা নীচ্‌দে পর শুও।

আমি চোখ বাঁধা অবস্থায় বুক নিচে দিয়ে উপুড় হয়ে শুলাম। শোয়ামাত্রই আর কথা নয়– আমার পিঠে, কোমরে পাছায়, পায়ে সর্বাংগে বুটের লাথি, বেতের সপাং-সপাং বাড়ির বৃষ্টি শুরু হলো। আমি যতোই আল্লা গো মাগো বলে চীৎকার দিয়ে এপাশ-ওপাশ করি, নির্যাতনের মাত্রা ততোই বাড়তে থাকে। ক'টি নর পশু যে আমার উপর এ অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম না। ঘাড়ের নিচ থেকে শুরু করে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আমার শরীরের সর্বাংগে পিঠে পাছায়–পায়ে সর্বত্র অবিরাম বুটের লাথি, ছড়ির বাড়ি পড়তেই থাকে। কতক্ষণ ক'ঘন্টা যে এই নির্মম, নিষ্ঠুর জল্লাদী অত্যাচার চলে আমি বলতে পারবো না– এক সময়

নির্যাতনেরব্যথা-বেদনা-জ্বালা সব ভুলে আমি বেহুঁশ হয়ে যাই।

একটা মিষ্টি নরম সুরের মধুর ডাকে আমি জেগে উঠি। চোখ আমার তখনো বাঁধা। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা, নিদারুণ যন্ত্রণা। কোন মতে ঠোঁট ফাঁক করে অস্ফুট বললাম ঃ কে-ডা?

ঃ এই নেন পানি। একটা ছোট ছেলে সান্‌কি ভরা পানি আমার মুখের কাছে দিয়ে বলে– আমি আবদুর রহিম, চারতলা বাড়ি। আমি সাব আপনারে চিনি। আমিত ভৈরব বাজারে কামকাজ করি। আপনের পেঁয়াজের গদী আছে। আপনে অনেকক্ষণ ধইরা 'পানি' 'পানি' করতাছেন। মিলিটারীর ডরে আইতে পারি নাই।

আমি পানি পান করছি, রহিম অনর্গল বলেই চলেছে ঃ জানেন, ভৈরবপুর রমজানের বাড়ির সুরুজ মিয়ারে ওইখানে টাংগাইয়া গুলী কইরা মারছে–

এক চুমুকে সবটুকু পানি খেয়ে আমি ফের ঘুমের কোলে ঢলে পড়ি।

আবার যখন জাগলাম, তখন চোখ খুলতে পারলাম না। চোখে কোন বাঁধন নেই কিন্তু এ কোন্ জায়গা? আমি কোথায়? পাশ ফিরতে চাইলাম, পারলাম না– সারা শরীরে জ্বালা, যন্ত্রণা, ব্যথা। উঠে বসতে চাইলাম, তা-ও পারলাম না– কোমরে অসহ্য বেদনা। ঘাড় কাত করতেই পাশে আমার সামসু মামুকে লাশের মত ঘুমন্ত দেখতে পেলাম। ঘরটাতে আরো তিন-চারজন মানুষ ঘুমুচ্ছে। একজনকে দেখলাম বসে আছে। আধো আলোতেও আমি তাকে চিনতে পারলাম। ধীরে ধীরে বল্লামঃ সাব, আপনে মোমতাজ মিয়া বি, এস-সি না? এক সময় ভৈরব বাজার ডাইল পট্টিতে থাকতেন?

ঃ হ মিয়া ঠিকই কইছো।

আমি এবার মনে বল পেয়ে বল্লাম ঃ আমি এখন কোথায় আছি?

ঃ এটা আশুগঞ্জ রেল ষ্টেশনের একটা রুম। এখন বন্দী শিবির।

ঃ আপনে এখানে বন্দী হইলেন ক্যামনে?

ঃ সে কথা আর কইও না। জলিল হাজী আমারে ধরাইয়া দিছে।

আমি এবার সাহস করে বলে ফেলি ঃ সাব, আমারে একটু তুইল্যা দিবেন– 'ওয়ালে' ঠেস দিয়া একটু বসি। আমি নিজে নিজে উঠতে পারছি না।

ঃ হ মিয়া, তোমারে শালারা মাইরা এক্কেবারে শেষ কইরা দিছে। মোমতাজ মিয়া সরে এসে আমাকে দু'হাতে ধরে দেয়ালের সাথে বসিয়ে দিলেন।

ঃ তোমারে আনছে বেহুঁশ অবস্থায়।

ঃ কোন্ সময় আমাকে আনছে?

ঃ এই তো রাত আটটার দিকে।

অথচ কি আশ্চর্য– আমি অতো সব কিছুই বলতে পারবো না। সামসু মামুকে দেখিয়ে বললাম ঃ ইনারে? ইনারে আনছে কখন?

মোমতাজ মিয়া একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন ঃ ইনাকে আনছে রাত দশটার পর।

আমি সামসু মামুকে ডাক দিতে উদ্যত হয়েছি, মোমতাজ মিয়া বাধা দিয়ে বলে উঠেন– না, না। উনাকে জাগাইও না, ঘুমাইতেছে ঘুমাক। উনাকেও মিলিটারীরা লাশ বানাইয়া

ফালাইছে।

আমি বসে বসে হাঁটুর উপর থেকে লুংগিটাকে সরাবার জন্য হাত দিয়ে টানছি, দেখি কাপড় আর সরে না। ভালো করে তাকাতেই দেখি, ও মাগো, লুংগিটা যে রক্তে আমার হাঁটু ও উরুর সাথে লেপটে একেবারে শুকিয়ে রয়েছে। আমার এই রক্তাক্ত অবস্থা দেখে আমার উপর পাশবিক নির্যাতন ও অত্যাচারের কথা মনে পড়লো। আমি আর কিছুই ভাবতে পারলাম না। আমার ফোলা ফোলা চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি পড়তে লাগলো। আমি শিশুর মতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শুধু কাঁদতে লাগলাম।

একটু ফর্সা হতেই আমি আস্তে আস্তে ডাকতে লাগলাম ঃ মামু–সামসু মামু–।

সামসু মামু চোখ মেলে আমাকে দেখতে পেয়েই সব ব্যথা-বেদনা ভুলে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ঃ ভাগনে, বাঁইচ্চা আছস?

ঃ 'ও মামু গো'– বলে চীৎকার দিয়ে আমিও সামসু মামুকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর মামা-ভাগ্নের পরস্পর জড়াজড়ি করে ধরে সে কি কান্না! সে কান্নার বুঝি শেষ নেই।

না, সব কিছুর মতো কান্নাও একদিন শেষ হয়। অসহনীয় ব্যথা-বেদনা ও নিদারুণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে তিন দিন বন্দী শিবিরে কাটাবার পর চতুর্থ দিন বন্দী শিবিরের দ্বার খুলে গেলো।

তালা খুলে দরজার সামনে দাঁড়ালো দু'জন রাজাকার কমাণ্ডার। কালিকাপ্র-সাদের শফি ও আমাদের পাশের বাড়ির নুরুল হক। দু'জনের কাঁধেই রাইফেল। শফি একটা কাগজ বের করে জোরে জোরে পড়তে লাগলো ঃ আবদুল হান্নান, পিতা হাজী চাঁন মিয়া, খালাস।

ঃ আয়–জলদি বাইর হ। নুরুল হক আমার দিকে তাকিয়ে তাগিদ দিতে লাগলো ঃ তর লাগি আর পান্না গেল না– তাড়াতাড়ি বাইর হ।

আমি একবার মামুর দিকে তাকিয়েই ঝট্‌পট বলে উঠলাম— না, আমি একলা যামু না। আমার সামসু মামুরে রাইখ্যা আমি বাইর অমু না।

ঃ আরে রাখ তর মামু! নুরুল হক মুখ ভেংচিয়ে বলে— তরে ছুটাইতেই কত কষ্ট করতে অইছে, আর এখন মারাছ মামু?

আমিও জোর দিয়ে বলে উঠিঃ না নুরুভাই, এটা হয় না। মামুরে রাইখ্যা ভাইগ্‌না কিছুতেই যামু না।

সামসু মামু আমারে ঠেলতে লাগলো– না ভাগ্‌নে তুই যা। তুই বাইর অইয়া আমার লাগি চেষ্টা করিস। তুই আগে যা।

ঃ না-না মামু, তোমারে এখানে রাইখা আমি যামু না।

নুরুভাই এবার রেগে উঠে ঃ তর মা-বাপের কান্দনের লাগি বাড়িত থাকতে পারি না। তর লাগি মেজর সাবরে ধইরা রিলিজের অর্ডার করাইছি। আর এখন তুই কস্ মামু ছাড়া যাইবি না। ঠিক আছে–মামুর লাগি যখন অত টান, থাক মামুর লগেই। মামুর লগে থাইক্যা এখানেই মর।

রাজাকার কমাণ্ডার নুরুভাই রাগ করে চলে গেলো। কমাণ্ডার শফি সাথে সাথেই দরজায় তালা লাগালো। দরজার সামনে তখন আমাদের গ্রামের আরো ক'জন রাজাকারকে দেখতে পেলাম।

এর মিনিট দুয়েক পরেই বন্দী শিবিরের পেছনের জানালা দিয়ে কে যেন আমার নাম ধরে ডাক দিলো ঃ হান্নান, হান্নান–আবদুল হান্নান–।

জানালায় উঁকি দিয়ে দেখি, ও পাশে এক রাজাকার দাঁড়িয়ে। আমাদের উত্তর পাড়ার ধনমিয়া।

ঃ তোমার কোন কিছু লাগবে নি?– ধনমিয়া জানতে চায়– তোমার আব্বার কাছে কইতে পারুম।

ঃ হ, হ, আব্বারে কইও আমার জামা-কাপড় পাঠাইতে। আর যদি পারে কিছু টাকা-পয়সা।

ঃ আইচ্ছা ঠিক আছে। আমিই লইয়া আমু।

তারপর দশদিন। দশদিন কাটলো এ নোংরা, অপরিচ্ছন্ন ছোট্ট রুমটাতে। আমরা বন্দী পাঁচজন। আমরা মামা-ভাগ্নে দু'জন, মোমতাজ মিয়া বি, এস-সি আর দু'জন মাটি কাটা শ্রমিক নবীনগর না নরসিংদীর, এখন মনে নেই। খাবার তো সেই চাপাতি আর পানি। সবচে' কষ্টকর ও অপ্রতিরোধ্য লজ্জাকর ব্যাপার ছিল প্রস্রাব-পায়খানা নিয়ে। ওই রুমটাতেই এক কোণার একটা বালতি দিয়ে বলেছে এ ঘরে বসেই বাথরুমের কাজ করতে হবে।

তবু আল্লার দরবারে লাখ লাখ শোকর যে, তেরদিনের মাথায় সামসু মামুকে নিয়েই বন্দীশালা থেকে বেরুতে পারি।

বাইরে এসে দেখি, দরজার সামনে রাজাকার বাহিনীর মাঝে আমার আব্বা, হামিদ দাদা, শান্তি কমিটির হাজী আম্বর আলী ও সামসু মামুর কে কে যেন দাঁড়িয়ে।

আব্বা আমাকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠলেন ঃ হায় আল্লাহ, আমার যাদুরে তুই এ কি করলি রে।

আমার বুকেও কান্নার ঢেউ। আশুগঞ্জ ষ্টেশনের প্লাটফর্ম তখন পিতা-পুত্রের মিলন-অশ্রুতে ভাসতে লাগলো।

হাঁটতে গিয়ে দেখি, ভালো করে দাঁড়াতেই পারছি না। আমার এ অবস্থা দেখে দৌড়ে এলো রাজাকার ধনমিয়া। ইয়া লম্বা, তাগড়া দেহের অধিকারী ধনমিয়া আমার কাছে এসে 'শালারা ত দেখি হান্নান ভাইরে একেবারে লুলা বানাইয়া লায়ছে' বলেই আমাকে একেবারে কাঁধে তুলে নিল। আশুগঞ্জ ষ্টেশন থেকে মেঘনাঘাট সবটুকু পথ রাজাকার ধনমিয়া আমাকে কাঁধে করে এনে নৌকায় তুলে দিলো।

কথাগুলো বলেই আবদুল হান্নান থামলো।

আমিও আমার কলমে ক্যাপ পরালাম। একাত্তর থেকে বিরানব্বই। একুশ বছর। আমার সামনে মাথার সব ক'টি চুল সফেদ সাদা, মুখে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি-গোঁফ, চোখে পাওয়ারফুল গ্লাসের পুরো চশমা পরিহিত প্রায় অথর্ব, কর্মহীন বায়ান্ন বছরের এক বৃদ্ধ। আজ আবদুল হান্নানের সেই ব্যবসাও নেই, মেঘনা পাড়ের গদিঘরও নেই। তার স্ত্রী একটি এনজিওতে চাকুরী করে সংসারের হালটি কোন রকমে ধরে আছেন।

'ইত্তেফাক' ঃ ২৬শে মার্চ ১৯৯২